কুঠারাঘাত করিতেছে, তাহাও চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন।

যখন বিদেশীয় হাব-ভাব, বিজাতীয় চাল-চলন, বিজাতীয় রীতি-নীতি আমাদের সমাজের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, অস্থি-মজ্জায়, শিরায় শিরায় প্রবেশলাভ করিয়াছে, তখন এ হেন দেবদুর্ল্লভ স্বর্গীয় ও সুপবিত্র হিন্দু-ধর্ম্মের ও হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি তাদৃশ অবজ্ঞা ও অনাস্থা প্রদর্শন কিছুই তেমন বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, মানবের এই মোহের অবস্থা যখন কাটিয়া যাইবে, তখন আবার আর্য্য-ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে সমগ্র পৃথিবী উদ্ভাসিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ের এই বিলাস-বিলোলা সমুন্নত সভ্যতা যখন স্বপ্নকাহিনীর মতও সুদূর ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির হৃদয়ে প্রবেশলাভ করে নাই,—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যখন বনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতগুহায় ও বৃক্ষ-কোটরে বাস করিয়াছে; গাছের বাকল পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিয়াছে, অপক্ক ফল বা বন্য-জন্তুর কাঁচা মাংস খাইয়া ক্ষুন্নিবারণ করিয়াছে; কিম্বা একে অন্যের বুকের রক্ত চুষিয়া কেমন একপ্রকার অমানুষিক উল্লাসে অট্টহাসে নাচিয়াছে,—ভক্তি-তত্ত্বের জন্মস্থানরূপিণী বেদ-বেদান্তপ্রসবিনী চিরপুণ্যময়ী ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষ তখনও আপনার জ্ঞান-ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া বিরাজ করিতেছিল। সেই সুখের দিনের কথা স্মরণ করিলেও হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

এদেশের লোক্ ধর্ম্মের জন্য একদিন কথায় কথায়, হেলায়, অবহেলায় আপনার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দান করিতে পারিত,—হায়, সে দেশের লোক আজ দেশের জন্য—সমাজের জন্য, ক্ষুদ্র স্বার্থটুকু পর্য্যন্ত বলিদান দিতে সঙ্কুচিত! যে দেশের লোক ধর্ম্মের জন্য আপনার প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হইত না, যে দেশের লোক ধর্ম্মের জন্য আপনার গায়ের মাংস অকাতরে কাটিয়া দিতে পারিতেন, যে দেশের লোক পরের কল্যাণের জন্য আপনার দেহের মর্ম্মাস্থিগুলি পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারিতেন, যে দেশের লোক সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইয়াও অম্লানবদনে আপনার রাজ্য ও রাজ-মুকুট প্রার্থীকে দান করিয়া স্ত্রীপুত্র সহ পথের ভিখারী সাজিতে পারিতেন,—সে দেশের—সে জাতির বর্ত্তমান ধর্ম্মের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কার চক্ষে অশ্রু সঞ্চার না হয়?

বর্ত্তমান সময়ে কাহাকেও ধর্ম্মের নিমিত্ত তেমন লালায়িত হইতে দেখা যায় না। ধর্ম্মের নিমিত্ত এক কথায় প্রাণ দিতে কেহই প্রস্তুত নহে। অধুনা কেবল মান, যশ ও স্বার্থ; এই তিনটীই সকল লোকের এবং সমাজের প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজকাল এ যুগের সভ্যতানুসারে যিনি যতই জাল, জুয়াচুরী, চালাকি, বজ্রুকি করিতে পারিবেন, তিনিই তত ধার্ম্মিক সভ্য ভব্য বলিয়া সমাজে পরি-গণিত হইবেন, আর্য্য-সমাজের এ দুরবস্থা কবে দূর হইবে?

কেবল পুরুষেরাই যে ধর্ম্মহীন হইয়াছে, তাহা নহে, পুরুষগণের বিকৃত শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে এ দেশের চির ধর্ম্মপরায়ণা রমণীগণও

কলুষিতা হইয়া উঠিতেছে। যে দেশের রমণীগণের পবিত্র সতীত্বের মহিমা-গানে সমস্ত পৃথিবী মুখরিত, যে দেশের সীতা, সতী, সাবিত্রী, শৈব্যা, দময়ন্তী, চিন্তা, গান্ধারী, সুভদ্রা, বেদমতী, বেহুলা প্রভৃতির ন্যায় রমণী-রত্নের কীর্ত্তি-গাথায় দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইত, যাঁহাদের চরিত্রে স্বার্থপরতা, কুটীলতা, পরশ্রী-কাতরতার নামগন্ধও ছিল না; হায় হায়! সে দেশের এমন দুরবস্থা,—ইহা একমাত্র ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ও বিশ্বাসহীনতার ফল নহে কি?

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কেবলমাত্র যে ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান ছিলেন এমন নহে, শৌর্য্য, বীর্য্যে, ঔদার্য্যে ও দয়া দাক্ষিণ্যাদিতেও তাঁহারা সমুন্নত ছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মকে তাঁহারা প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। তাহা না হইলে তাঁহাদের ধর্ম্মযুদ্ধ, ধর্ম্ম-কথা, ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণাদির অক্ষরে অক্ষরে গাঁথা থাকিত না। বেদই বল, পুরাণ, দর্শন, উপনিষদ,স্মৃতি,শ্রুতি,মনুই বল,সেই যুগের যাহা কিছু খুঁজিবে,তাহাতে কেবল ধর্ম্মানুমোদিত,ধর্ম্ম-তত্ত্ব পূর্ণ সময়োপযোগী সদুপদেশাদির জ্ঞানময় অক্ষয়ভাণ্ডার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। বিশেষতঃ ধর্ম্মই, ধর্ম্মপ্রাণ মানবের একমাত্র গতি। ধর্ম্মহীন ব্যক্তি পশুসদৃশ। "ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ" পশু হইতে মানবের শ্রেষ্ঠতা কেবল ধর্ম্ম লইয়া। হায়, অধঃপতিত হিন্দুজাতি আবার কবে হিন্দুশাস্ত্রের সেই মহাবাণী স্মরণ করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিক হইবে, তাহা কে বলিবে?

মোহান্ধ ও অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী বা আর্য্য-কুল-কুলাঙ্গারেরা বর্ত্তমান যুগের এই মোহ-মুহূর্ত্তের ক্ষণিক সুখে বা ক্ষণিক দুঃখে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ভারতের সেই চির-কীর্ত্তনীয় ধর্ম্ম-পরায়ণ দেবকল্প মহাপুরুষদিগকে অনায়াসে ভুলিতে পারিয়াছে, যাঁহাদিগের পদরজঃস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হইয়াছিল, যাঁহাদের অজেয় শক্তির আকর্ষণে ভারতের কাব্য-সাহিত্যে অমৃত-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল,—যাঁহাদিগের গুণ-গৌরব ও সৌন্দর্য্য-বিভবে বিমোহিতা হইয়া কবিতা সুন্দরী একদিন প্রেমাধীনা দেব-কন্যার মত ভারতের কবি-কুঞ্জে কোকিলার প্রমত্তকণ্ঠে মধুর গীতি গাহিতেছিল,—অপদার্থ ও অধর্ম্মপরায়ণ ভারতবাসী আজ দিনান্তেও তাঁহাদিগকে একবার স্মরণ করে না—একবার সেই অতীত সুখের কথা মনে করিয়াও অশ্রু-বিসর্জ্জন করে না! হায়, পরম অকৃতজ্ঞ আমরা, তাঁহাদিগকে যতই কেন ভুলিয়া থাকি না—পৃথিবীর ইতিহাস কখন তাঁহাদিগকে ভুলিবে না। ইতিহাসই অতীতের চিরন্তন সাক্ষী। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্ম ও গৌরব-বিভবের কথা আজিও তেমনই উজ্জ্বলাক্ষরে শোভা পাইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা মোহান্ধ। আজ এই চিন্তাই আমাদের প্রধান চিন্তা—কবে আমাদের এ মোহ টুটিবে—কবে ভারতবাসী আবার ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া সেই ধর্ম্মগত-প্রাণ আর্য্যজাতির অপার মহিমা কীর্ত্তন করিবে? হায়! বুঝি সে দিন আর ফিরিয়া আসিবে না।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

—o—

সীতা।

(১)

"পাপেভ্যশ্চ পুণ্যাতু বৰ্দ্ধয়তু চ শ্রেয়াংসি শ্রেয়ং কথা।
মঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতো মাতেব গঙ্গেব চ।" *

ভারত-মহিলার নিকট সীতা আদর্শ সতী-রূপে চির-পরিচিতা ও নিত্য পূজিতা মূর্ত্তিমতী দেবী। ভারত-ললনা সীতার কথা—সীতার অমিয় মধুর পুণ্য-প্রসঙ্গ বলিতে যত ভালবাসেন, স্বীয় প্রিয়জনের গুণ-কীর্ত্তনেও বুঝি বা তত উৎসাহী ও অভিলাষিণী নহেন। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে সীতা-চরিত্রে জানিবার, বুঝিবার ও শিখিবার অনেক কথা আছে। কস্তুরীর ক্ষুদ্র কৌটাটী উন্মোচন কর, সৌরভে দশদিক ভরপুর হইবে। সীতার ক্ষুদ্র কাহিনী আলোচনা কর, চরিত্র-সৌরভে হৃদয়-মন পরিপূর্ণ হইবে।

সীতা আদর্শ রমণী। পৃথিবীর অনন্ত কোটি অবলাকে পতিপ্রাণা ও পতিমাত্র-পরায়ণা, অসীম প্রেমময়ী সতীর পবিত্র জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দিবার জন্যই এ জগতে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। বিশ্ববাসী নর-নারীগণকে পতিব্রতা-ধর্ম্মের সারতত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই এ সুখ-দুঃখ পূর্ণ সংসারে সুখ-দুঃখের অনন্ত-পসরা মাথায় লইয়া সংসার নির্লিপ্তা বর্ষীয়সী তাপসীর ন্যায় সীতা তাঁহার জীবনের কয়টা বৎসর - সুদীর্ঘকালের ন্যায় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। যুগের পর যুগ—শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, আজিও ভারতবাসীর অযুত-কোটী প্রাণ রাম-সীতার অমল কীর্ত্তি—প্রেমময় রাম ও পুণ্য-পুঞ্জময়ী সীতার অমিয় মধুর পবিত্র কাহিনীর ভক্তি-উচ্ছাসে নিয়ত বিভোর রহিয়াছে; আজিও ভারতবাসী রাম-জানকীর পবিত্র নামোচ্চারণে নয়ন-জলে ভাসিয়া, ভক্তির অনন্ত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত হইয়া তাঁহাদের পদতল উদ্দেশ্যে প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতঃ সেই মধুর চরিত্রের পুণ্য-কাহিনীর আলোচনায় ভাগীরথীস্নাত নর-নারীর ন্যায় পুণ্য সঞ্চয়ে কৃতার্থ হইতেছে।

ফলতঃ রাম-সীতার পবিত্র গাঁথা চির-প্রীতি পবিত্রতা পূর্ণ অনন্ত মঙ্গলপ্রদ অপূর্ব্ব অমৃত কুম্ভ বিশেষ। প্রার্থনা, ভারতের নর-নারী এ অমৃত-পানে চির-অমরত্ব লাভ করুক—শোক-দুঃখ পূর্ণ এ পৃথিবী চিরমঙ্গল বিধায়িনী অনন্ত শান্তির আধার হউক।

সীতা-চরিত্র বুঝাইতে হইলে রামায়ণের অনেক কথা লিখিতে হয়। কিন্তু বহুবিস্তৃত রামায়ণী অমৃত এ ক্ষুদ্র পাত্রে পরিবেশন সম্পূর্ণ অসম্ভব। অথবা রামায়ণী গাঁথা—রামায়ণের সে অমৃতময়ী মধুর কথা, এখানে বিবরিয়া বলিবার তেমন প্রয়োজনও নাই। কারণ ভারত-মহিলারা বহুদিন সে অমৃতপান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তবে অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী সতী-শিরোমণি সীতাকে রামায়ণের সে অমৃতকুম্ভ হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে লোকচক্ষুর গোচরিভূত করিতে হইলে, যতটুকু না দেখাইলে নয়, এ স্থলে সে চিত্রটুকু অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইব মাত্র। সাধনায় সিদ্ধিলাভ শ্রীভগবৎ-কৃপাধীন।

* "সেই জগজ্জননী, জগজ্জনমনোহারিণী; জননীর ন্যায় জগতের হিতকারিণী, ভাগীরথীর ন্যায় দুরিতনাশিনী জানকীর চরিত্রকাহিনী মনুষ্যকে পাপ হইতে ত্রাণ করুক; এবং সকলেরই শুভসম্পৎসংবর্দ্ধনে সামর্থ হউক।"

সে অনেক দিনের কথা। তখনও সত্য-যুগের সেই চির-শান্তিপ্রদ সত্য-ধর্ম্মের পবিত্র মধুর গীতধ্বনি দূরাগত বংশীরবের ন্যায় বিশ্ব-বাসীর হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছিল। ত্রেতার সেই সুবর্ণ যুগে—সত্য-ধর্ম্মের সেই মধুময় শুভ বসন্তে ভারতের পুণ্য বক্ষঃপ্রবাহিত সুখ-দর্শনা সরযূনদীর তটে অযোধ্যার ভুবন বিখ্যাত রাজপাটে মহাপ্রাণ মহাবীর সত্যসন্ধ রাজা দশরথ সমাসীন ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র এই রাজা দশরথের সর্ব্বগুণাধার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

রাজা দশরথের তিন মহিষী; কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। প্রধানা মহিষী কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। রাজা দশরথের সুশিক্ষা বিধানে ইঁহারা সকলেই মহাবীর, মহা-ধনুর্দ্ধর, মহাধার্ম্মিক মহাত্মা এবং যারপরনাই মাতৃপিতৃভক্ত ও ভ্রাতৃ-বৎসল বলিয়া বিশ্ব বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন।

বিহার প্রদেশের যে স্থান এখন ত্রিহুত নামে খ্যাত—প্রাচীনকালে ত্রেতার সেই সুবর্ণযুগে উহা মিথিলা বা বিদেহরাজ্য নামে পরিচিত ছিল। চন্দ্রবংশ সম্ভূত ক্ষত্রিয় রাজা মহাত্মা জনক এই সুবিস্তৃর্ণ রাজ্যের একেশ্বর অধিপতি ছিলেন। তিনি নিরতিশয় ধর্ম্মবল-গৌরবে ও আপনার সুনির্ম্মল চরিত্র-বৈভবে ঋষি তুল্য ছিলেন বলিয়া গুণগ্রাহী উদার প্রকৃতি মুনি-ঋষি-গণ তাঁহাকে রাজর্ষি উপাধি প্রদানে বিভূষিত করিয়াছিলেন; তাই লোকে তাঁহাকে রাজর্ষি জনক বলিত। তিনিও এই মহা গৌরবজনক উপাধিলাভের অযোগ্য ছিলেন না; বরং তাঁহার ন্যায় সর্ব্বজনবরনীয় সর্ব্বগুণাধার মহাশয় ব্যক্তিকে এ উপাধি প্রদান করায় উপাধিরই গৌরব বাড়িয়াছিল। রাজর্ষি জনক আদর্শ ধার্ম্মিক ও আদর্শ-ভূপতি ছিলেন। তিনি অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া প্রজারঞ্জক রাজার যথার্থ প্রাপ্য রাজভক্তি—প্রকৃতি পুঞ্জ-প্রদত্ত অনন্ত প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি—অপরিসীম শ্রদ্ধা লাভ করিয়া স্বীয় আদর্শ-নরপতি নামের সার্থ-কতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্য পরায়ণ, সমদর্শী ও ন্যায়বান ভূপতির সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। রাজা জনক একাধারে অনাসক্ত সংসারী ও যোগনিরত যোগী দুইই ছিলেন। ধর্ম্মজগতে তিনি অতি উচ্চ স্থানে অধিরোহণ করিয়া-ছিলেন। তিনি সংসারে থাকিয়া—একটা সুবিশাল রাজ্যের রাজা হইয়া অনাসক্ত-চিত্তে সর্ব্ব কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতেন, অথচ তিনি বিষয়-বাসনাবিহীন নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী—যোগনিরত মহা যোগী! রাজর্ষি জনক মহাজ্ঞানী মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন; তাই জ্ঞান-গুরু ব্রাহ্মণগণও তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব বিস্মৃত হইয়া তাঁহার নিকট শাস্ত্রতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ গ্রহণে কুণ্ঠিত হইতেন না। দলে দলে তত্ত্বপিপাসু ঋষিগণ আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা লাভে কৃতার্থ হইতেন। রাজর্ষি জনক রাজসভায় সম-বেত মুনি-ঋষিগণের আলোচিত ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেই বিশ্ববিখ্যাত উপনিষদ গ্রন্থ সমূহের সৃষ্টি। এ হেন অযোধ্যার রাজা ভুবন-বিজয়ী দশরথ এবং রাজর্ষি জনক বিশ্বের নিকট চির-পরিচিত।

সীতা এই রাজর্ষি জনকের প্রাণাধিকা দুহিতা এবং রাজা দশরথের প্রিয়তম পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের বণিতা।

জনক দুহিতা সীতা মাতৃহীনা। জন্মাবধি তিনি মাতৃ-মুখ দেখিতে পান নাই। ধরিত্রী দেবীকেই তিনি মাতা বলিয়া জানিতেন। এবং তাঁহারই স্নেহ-শীতল সুবিশাল ক্রোড়ে লালিতা-পালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা বলিয়া সীতা-চরিত্র বসুধারই অনুরূপ সহিষ্ণুতার আধার হইয়াছিল।

সীতার জন্মবিবরণ গভীর তমসাচ্ছন্ন এবং অদ্ভুত রহস্য-পূর্ণ ঘটনায় সমাচ্ছন্ন। রামায়ণে কথিত আছে, একদা রাজর্ষি জনক যজ্ঞ-ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার হলাগ্রে এক পরমা-সুন্দরী কন্যা-রত্ন সমুত্থিত হয়, ক্ষেত্র শোধনে হলমুখোত্থিতা বলিয়া সেই অযোনী-সম্ভবা কন্যাই সীতা নামে পরিচিতা হইয়া জনক রাজ-গৃহে প্রতিপালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন। লাঙ্গল-পদ্ধতিকে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় "সীতা" বলা হইত ; সীতা হইতে এই কন্যারত্ন সমুত্থিত বলিয়া প্রাপ্ত-কন্যার নামও সীতা রাখা হইল। স্নেহশীল জনক নিজ দুহিতার ন্যায় পরম যত্ন সহকারে ইঁহাকে লালনপালন করেন। রাজর্ষি জনক মিথিলা বা বিদেহ-রাজ্যের ভূপতি ছিলেন। জনকের কন্যা বলিয়া সীতাকে জানকী এবং মিথিলা বা বিদেহদেশের রাজকন্যা বলিয়া মৈথিলী বা বৈদেহী নামেও অভিহিত করা হয়। সীতা রাজর্ষি জনককে তাঁহার পিতা এবং জনক রাজমহিষীকে মাতার ন্যায়ইশ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। বাল্মীকি রামায়ণ পাঠে সীতার জন্ম সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কোন বিবরণ জানা যায় না।

সীতা রাজর্ষি জনকের ঔরসজ কন্যা বলিয়াও প্রবাদ আছে। আবার সীতা অপ্সরা গর্ভজাত লঙ্কাধিপতি রাবণ-কন্যা কি রাবণ-পত্নী মন্দোদরীর কুমারীকালে প্রসূত দুহিতা বলিয়াও জনশ্রুতি শুনা যায়। * জানি না, এসব জন-শ্রুতির মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে কিনা। তবে বাল্মিকী রামায়ণ, কৃত্তিবাস রামায়ণ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ-পত্র ও জনশ্রুতি হইতে ইহা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হয় যে, সীতা রাজর্ষি জনকের যজ্ঞ-ভূমে প্রাপ্ত পালিতা কন্যা। মহামূল্য স্পর্শমণি খনিগর্ভ সম্ভূত বলিয়াই উহা চিরদিনই বিশ্ব-সমাদৃত মহারত্ন। রমণী-রত্ন সীতার জন্ম যেরূপভাবে যাঁহার গর্ভেই হইয়া থাকুক না কেন, তিনি যে সতী-কুল শিরোমণি আদর্শ রমণী বলিয়া জগতে চিরবরণীয়া ও চিরস্মরণীয়া হইয়া থাকিবেন,তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সীতা বিশ্ব-পূজ্যা আদর্শ-মহিলা।

* একদা বিমান বিহারিণী স্বর্গ-বিদ্যাধরী রূপসী উর্ব্বশীর অনুপম রূপ-লাবণ্য দর্শনে রাজর্ষি জনক স্খলিত বীর্য্য হইয়াছিলেন। সেই বীর্য্য ধারণে ঋতুমতী বসুন্ধরা দেবী গর্ভবতী হইয়া অচিরে এক ডিম্ব প্রসব করেন, রাজর্ষি জনক যজ্ঞ-ভূমি কর্ষণকালে উহা প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহে লইয়া যান ; সেই ডিম্ব হইতে সীতার জন্ম হয়। জনকের উক্ত স্খলিত বীর্য্য এক পক্ষিনী পান করিয়া যজ্ঞ-ভূমে সদ্য ডিম্ব প্রসব করিয়া রাখিয়া যায়—বলিয়াও জনশ্রুতি আছে। আমাদের বিশ্বাস সুকবি কৃত্তিবাস প্রণীত রামায়ণই উক্ত অসম্ভব প্রবাদ বাক্য সমুহের নিদান। এ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস-রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত আছে :—

"মিথিলার ভূপতি জনক নামে ঋষি।
পুত্রের কারণে রাজা যজ্ঞ-ভূমি চষি।
স্বহস্তে লাঙ্গলে রাজা চাষ-ভূমি চষে।
উর্ব্বশী চলিয়া যায় উপর আকাশে।
তাহাকে দেখিয়া কামে জনক মোহিত।
হঠাৎ ঋষির বীর্য্য হইল স্খলিত।

বালিকা সীতার কুমারী জীবন সম্বন্ধে রামায়ণে বিশেষ কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জানকী রাজর্ষি জনকের পালিতা কন্যা; আর ঊর্ম্মিলা তাঁহার নিজ কন্যা এবং মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি জনকের অনুজ কন্যা। ইহারা সকলেই জনকরাজ গৃহে জনকেরই স্নেহ-শীতল ক্রোড়ে একত্র লালিতা পালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা সত্ত্বেও রাজর্ষি জনক সকল কন্যা অপেক্ষা সীতাকেই অত্যধিক স্নেহ করিতেন, একথা রামায়ণে সুস্পষ্ট উক্ত আছে। অবশ্য পবিত্র চরিত্রা পুণ্যময়ী সীতার সুনির্ম্মল চরিত্র প্রভাবই যে সেরূপ স্নেহাকর্ষণের একমাত্র নিদান, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋষিরা সমদর্শী হইলে ও পাত্র নির্ব্বিশেষে—সমধিক সুপাত্রে তাঁহাদের স্নেহাধিক্য অস্বাভাবিক দৃশ্য নহে। রাজকুমারী সীতার স্বভাব গুণে তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী ঊর্ম্মিলা প্রভৃতি ভগিনীগণ, মাতাপিতা প্রভৃতি ভক্তিভাজন গুরুজন ও পুরবাসী-পুর-বাসিনীগণ এবং নিয়ত ক্রীড়াসঙ্গিনী সখীজন সকলেই তাঁহাকে যারপরনাই স্নেহ, ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দর্শন করিত। সীতা মাতৃহীনা। জন্মিয়া অবধি তিনি জননীর মুখ দেখিতে পান নাই,—জননীর পীযুষ তুল্য স্তন্য পান করিয়া,—তাঁহার স্নেহ-শীতল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া প্রাণের শান্তি—পিপাসার পরিতৃপ্তি করিতে পান নাই। তথাপি আপনার দেবদুর্লভ চারু-চরিত্র প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার অমিয়-মধুর সুকোমল গুণরাশিতে সংবর্দ্ধিতা হইয়া, প্রতিপালক পিতা-মাতার অপ্রতিম স্নেহ, ভগিনীগণের মধুর ভালবাসা এবং পুরবাসী ও পুরস্ত্রীগণের অকৃত্রিম স্নেহ-ভক্তি লাভ করিয়া জগতে নারী-রত্ন বলিয়া প্রীতি-ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি-ভাজন হইয়া গিয়াছেন। একজন রমণীর পক্ষে ইহা সামান্য সুখ-সৌভাগ্যের বিষয় নহে। সীতা নারী-শিরোমণি পরম ভাগ্যবতী রমণী।

সীতা রাজর্ষি জনক ও জনক-মহিষীর অতুল স্নেহ-যত্নে জনক-গৃহে প্রতিপালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন। তাঁহার বাল্য ও কৈশোর জীবন অতীত হইল। ক্রমে তিনি যৌবনের সীমারেখায় পদার্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার রূপ-গুণমাধুরী ক্রমশঃ

দৈবযোগে পৃথিবী আছিল ঋতুবতী।
ঋষি বীর্য্য পড়িলে হইল গর্ভবতী॥
ডিম্বরূপে ভূমি মধ্যে ছিল বহুকালে।
ভাসিয়া উঠিল ডিম্ব লাঙ্গল শিরালে॥
ডিম্ব ভাঙ্গি জনক করিল খান খান।
কন্যা এক দেখে তায় লক্ষ্মীর সমান॥
"উঙা উঙা" করি কান্দে যেন সৌদামিনী।
আচম্বিতে আকাশে হইল দৈববাণী॥
চাষ ভূমি হৈতে এই কন্যার জনম।
তব কন্যা বটে এই করহ পালন॥
শুনিয়া জনক বড় হরিষ অন্তরে।
কন্যা কোলে করিয়া তখন আসে ঘরে।
পরমা সুন্দরী কন্যা যেন হেমলতা।
শিরালে হইল জন্ম নাম রাখে সীতা॥"

কৃত্তিবাস।

অপর প্রবাদ বাক্যগুলি এইরূপ,—লঙ্কেশ্বর রাবণ-রাজ-মহিষী মন্দোদরী কুমারীকালে দৈবপ্রভাবে এক কন্যা-রত্ন প্রসব করিয়া লোকলজ্জা ভয়ে হাঁড়ী ভরিয়া সেই সদ্য প্রসূত কন্যা-রত্নকে স্রোতজলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, যজ্ঞ ভূমি কর্ষণকালে রাজা জনক উহা প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহে আনিয়া সযত্নে প্রতিপালন করেন। অথবা উর্ব্বশী নাম্নী স্বর্গবিদ্যাধরী রাবণ বীর্য্যে গর্ভবতী হইয়া রাজর্ষি জনকের যজ্ঞার্থ কর্ষিত ভূমে প্রসব করতঃ স্বস্থানে প্রস্থান করেন। মহারাজ জনক উহাকে প্রাপ্ত হইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। সেই কন্যার নামই সীতা। এতদিন পরে কে ইহার সত্য উদ্ঘাটন করিবে?

শতগুণে বিকশিত হইতে লাগিল। সীতাকে যে দেখিত সেই মনে করিত, এত রূপ—এত গুণ এও কি মানুষীর সম্ভবে ?—সীতা মর্ত্তের মানবী নহেন; শাপ-ভ্রষ্টা স্বর্গের দেবী। কন্যার অসাধারণ রূপ-লাবণ্য, অনুপম গুণগরিমা ও অনন্য-সাধারণ সর্ব্ব সুলক্ষণ দর্শনে জনক ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী আপনাদিগকে পরম ভাগ্য-বান ও ভাগ্যবতী মনে করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন। জনক রাজ-ভবনে সমাগত মুণি-ঋষিগণ সীতাকে দর্শন করিয়া—একাধারে এত রূপ-গুণ ও সুলক্ষণের মণি-কাঞ্চন যোগ বা মধুর সমাবেশ অবলোকনে বিস্ময়াভিভূত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেন, এত অনন্ত রূপের ডালি—এত অসাধারণ গুণ যাঁহার, তিনি কখনই মানবী নহেন, হয়ত জনকের অসাধারণ পুণ্য ফলে কোনও দেবী আসিয়া কন্যারূপে জনক-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রমে তাঁহাকে অগর্ভসম্ভুতা স্বর্গ-ভ্রষ্টা দেবীমূর্ত্তি বলিয়াই সকলের ধারণা জন্মিল। এবং সকলেই সীতাকে সাধা-রণ মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র ভাবিয়া একটুকু বিশেষ সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রাজ-কন্যা বলিয়া সীতার এ সম্মান নহে, সীতার এ গৌরব আপনার অলৌকিক রূপ-গৌরবে ও অসাধারণ চরিত্র-বৈভবে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র চিরদিন রূপগুণের এরূপ গৌরব—এরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তির পূজার বিধান।

কন্যাকে পরিণয় যোগ্য বয়সে পদার্পণ করিতে দেখিয়া স্নেহ-প্রবণ পিতামাতা এ অনন্ত রূপ-গুণের স্বর্গীয় সোণারডালি কাহার হস্তে তুলিয়া দিবেন, সেজন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা মনে মনে কত দেশের কত রূপগুণ ও ঐশ্বর্য্যশালী রাজকুমারের কথা—কত মহাবীর মহারাজের কথা ভাবিলেন, কিন্তু কাহাকেও সীতার অনুরূপ যোগ্য বর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না।

সেকালে এদেশে নানারূপ উপায়ে কন্যার জন্য বর নির্ব্বাচনের রীতি প্রচলিত ছিল। কন্যার জনক বা আত্মীয়-স্বজনেরা অনুসন্ধান পূর্ব্বক স্বীয় মনোনীত উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতেন। ইহাই ছিল কন্যা বিবাহের সাধারণ প্রথা। এরূপ বিবাহবিধানে প্রায় অধিকাংশ স্থানেই কন্যার অভিমত পরিগৃহীত হইত না; কুত্রাপি মত গৃহীতও হইত। এখনও এ দেশে সেই প্রথাই বিদ্যমান আছে। কিন্তু সেকালে অধিকাংশ স্থলেই রাজকন্যারা স্বয়ংবরা হইতেন। অবশ্য সাধারণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল না। কন্যার পিতাই কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বিচনার্থ স্বয়ংবর-সভার অনুষ্ঠান করিতেন। স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইবার জন্য স্বজাতীয় রাজন্যবর্গের নিকট সাদর নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরিত হইত। তদনুসারে নির্দ্ধা-রিত কালে নানা দিগ্‌দেশীয় বিবাহার্থী রাজা ও রাজকুমারগণ আসিয়া স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইতেন। যথাকালে বরমাল্য করে কন্যা আসিয়া সভাস্থলে উপনীত হইতেন। অনন্তর স্তুতি পাঠক ভাটগণ কর্ত্তৃক সমাগত রাজা ও রাজকুমারগণের পরিচয় ও গুণ-কীর্ত্তন হইত, পতি-প্রার্থিনী কন্যা তন্মধ্য হইতে আপনার ইচ্ছানুরূপ পাত্রের গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়া তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়া লইতেন। কিন্তু

সকলস্থলে এ বিবাহ নির্ব্বিবাদে ও নিরাপদে নির্ব্বাহিত হইত না। অনেক স্থলেই উপেক্ষিত রাজা ও রাজকুমারগণ কন্যালাভে বিমুখ হইয়া মহা আহবের অনুষ্ঠান করিয়া বসিতেন। সহসা সুশোভন বিবাহ-সভা ভীষণ রণক্ষেত্রে পরিণত হইত। এতদ্ব্যতীত শক্তিশালী ক্ষত্রিয় রাজ-সমাজে শক্তি-পরীক্ষা পূর্ব্বক বর নির্ব্বাচনের প্রথাও প্রচলিত ছিল। সে শক্তি-পরীক্ষায় বীরত্বে যিনি বিজয়ী হইতেন, তাঁহাকেই কন্যার যোগ্য বর বিবেচনায় কন্যা সম্প্রদান করা হইত।* অবশ্য সাধারণ সম্প্রদায় মধ্যে এই শেষোক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল না। অপত্য-বৎসল জনক সুচিন্তার ফলে সীতার বিবাহের জন্য এই শক্তি-পরীক্ষা বিধান অবলম্বন করাই সমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠ-পুত্র মহারাজ দেবরাত এক সময় মিথিলার রত্নময় সিংহাসনে অভিষিক্ত ছিলেন। অতি পূর্ব্বকালে —সৃষ্টির সেই আদিযুগে দক্ষপ্রজাপতি স্বীয় জামাতা দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া এক শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞেশ্বর মহাদেবকে অবজ্ঞা করিয়া—তাঁহাকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য যজ্ঞাংশ প্রদান না করিয়া দেব-সমাজে মহামান্য মহাদেবকে অপমানিত করাই প্রজাপতি দক্ষের এরূপ অশিব যজ্ঞানুষ্ঠা-নের একমাত্র উদ্দেশ্য। দেবগণ ইহার কোন প্রতিবিধান না করায় অনিমন্ত্রিত অবজ্ঞাত রুদ্রকেশ্বর দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংসের নিমিত্ত এক বিশাল ধনুগ্রহণ করিয়া যজ্ঞস্থলে উপনীত দেবগণের শিরচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অতঃপর দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া আশুতোষ উক্ত বিশাল ধনু তাঁহাদিগকে প্রদান করেন। দেবতারা কৃপা করিয়া সেই বিরাট হরধনু মহা-রাজ দেবরাতের নিকট গচ্ছিত রাখেন। তৎ-কালাবধি মহাদেব-দত্ত সেই মহাধনুক মিথিলার রাজ-ভবনেই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যায়। অনন্তর অপত্য-বৎসল রাজর্ষি জনক তাঁহার প্রাণাধিকা তনয়া সীতাকে যোগ্য বীরের হস্তে সম্প্রদান করিবার মানসে এই পণ নির্দ্ধারিত করিলেন যে, যে বীর এই সুবিশাল সুদৃঢ় হর-ধনু ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবেন, সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা সীতা তাঁহারই করে অর্পিতা হইবেন। ইহারই নাম "ধনুভঙ্গপণ।"

আমরা সীতার প্রথম দর্শন পাই রাজর্ষি জনক ভবনে—ধনু-ভঙ্গ পণে। বিবাহ প্রসঙ্গে সীতা আর দশ জন বালিকার ন্যায় চিত্তে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করিতে পান নাই। অনাস্বাদিত পূর্ব্ব ভাবী সুখের মধুর কল্পনার সহিত পিতার ধনুর্ভঙ্গ পণের বিষয় স্মরণ করিয়া, —কোন্ দানব-দৈত্য বা অসুর প্রকৃতির বরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, এই দুশ্চিন্তায় তিনি নিয়ত মগ্ন থাকিতেন। এবং আপনার অনুরূপ পতি লাভের প্রার্থনায় সময় পাত করিতেন।

অতঃপর রাজর্ষি জনক সীতা-বিবাহের এই ধনুর্ভঙ্গ পণের কথা দেশদেশান্তরে ঘোষণা করিয়া দিলেন। পৃথিবীময় একথা প্রচারিত হইল। নানা দিকদেশ হইতে কত রাজা ও

* প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ প্রভৃতি আরও পাঁচ প্রকার বিবাহ-পদ্ধতির বিধান দৃষ্ট হয়, সেগুলি নিন্দিত বিধান বলিয়া সমাজ-বর্জ্জিত; সুতরাংই উল্লেখ যোগ্য নহে।

রাজকুমারেরা জগৎলক্ষ্মী সীতার পাণী প্রার্থী হইয়া মিথিলায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই সে সুদৃঢ় বিশাল হরধনুতে জ্যা যোজনা করা দূরে থাকুক, উহা উত্তোলন করিতেও সমর্থ হইলেন না। প্রত্যাখ্যাত, অবজ্ঞাত, পরাজিত নৃপতিগণ অতিশয় কুপিত হইয়া সকলে মিলিয়া মিথিলাপুরী—জনকরাজ ভবন অবরোধ করিলেন। কুমারী সীতার তৎকালিন মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। হায়, তাঁহার জন্যই তাঁহার নিরপরাধ প্রতিপালক পিতা জনকের পুরী আজ শত নৃপতি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ। শত শত, লক্ষ লক্ষ সৈন্য সেনাপতি আজ তাঁহার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ভীষণ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ। কিন্তু বিধাতার চিরমঙ্গলময় বিধানে সম্বৎসরের পূর্ণ ভীষণ আহবের পর বিজয়লক্ষ্মী রাজর্ষি জনকের অঙ্কশায়িনী হইলেন। পরাজিত নৃপতিগণ লজ্জাবনত মুখে দেশ দেশান্তরে প্রস্থান করিলেন। সীতার এক বিষম দুশ্চিন্তার অবসান হইল। কিন্তু রাজর্ষি জনকের চিন্তার অবসান হইল না। যুদ্ধাবসানে পরাভূত নৃপতিগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, অপত্য বৎসল জনক আপনার কঠিন পণের বিষয় স্মরণ করিয়া—কন্যার বিবাহের জন্য বিশেষ ভাবিত হইলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কত দেশের কত পরাক্রান্ত রাজা—কত মহাবীর রাজপুত্র আসিলেন, তাঁহারা যে এ বিশাল ধনুখানি উত্তোলন করিতেও সমর্থ হইলেন না!—তা, ধনুতে জ্যা যোজনা করা ত দূরের কথা! হায় এ পৃথিবী কি বীরশূন্যা হইয়া পড়িলেন?—এ জগতে কি এমন বীর কেহ নাই—যিনি এ সুদৃঢ় ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক আমাকে এ বিষম প্রতিজ্ঞা-পাশ হইতে মুক্ত করিতে পারেন? বিধাতা কি জানকীর অদৃষ্টে বিবাহ লিখেন নাই—তবে কি মা আমার চিরকুমারীই থাকিবেন? কিন্তু আমি নিরুপায়; জানকী আমার প্রাণাধিক স্নেহের পাত্রী হইলেও তাহার জন্য কিছুতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ দুরপণেয় পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে পারিব না;—কিছুতেই এ কঠিন পণ ভঙ্গ করিব না; ইহাই আমার দৃঢ় সঙ্কল্প। মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার মনে যাহা থাকে তাহাই হইবে,—তাঁহার ইচ্ছারই জয় হউক।

ক্রমশঃ—

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

বঙ্গে প্রতিযোগিতা।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিচালিত বঙ্গদেশে যেদিন প্রতীচ্য ভূখণ্ডের সাম্যবাদের কথা, আর সেই সাম্যবাদের সহিত সমান প্রতিযোগিতার কথা, টিকিয়া থাকিবার জন্য নির্ব্বাক দ্বন্দ্ব করিবার নীতি প্রচারিত হইয়াছিল, সেদিন বঙ্গসমাজের পক্ষে এক মহা যুগান্তরের দিন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য সংগ্রাম করিবার কথা (struggle for existence) শুনিলে মানুষের সেই আদিম অবস্থার কথা মনে পড়ে। মানুষ যখন সমাজ গঠন করিয়া দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে শিক্ষা করে নাই,

মানুষের সেই আদিম অবস্থায় তাহার জীবন রক্ষার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইত, তাহার আলোচনা করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। নিত্য আহার্য্য সংগ্রহের জন্য অহরহঃ ঐকান্তিক চেষ্টা এবং সেই চেষ্টার ফলে একের সহিত অন্যের ভীষণ প্রতিযোগিতা ও ভীষণ সংগ্রাম—এই ত মানবের আদিম অবস্থা। এখনও যেখানে সভ্যতা লোকের কিছুমাত্র রশ্মিও প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই সকল গিরি-গহ্বরে, গহন কাননে এই অবস্থাপন্ন অসভ্য লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের জীবন পশু জীবনের সহিত কিছুমাত্র পৃথক নহে।

এই পশু জীবন হইতে মনুষ্য জীবনকে উচ্চতর স্তরে পরিণত করাই মানব-জীবনের সার্থকতা। মানব ক্রমে ক্রমে সমাজবদ্ধ হইতে শিখিয়া সংগ্রামের পরিবর্ত্তে ভাগীরথীর পূতধারা সদৃশ সহানুভূতির অমৃত স্পর্শে মানব জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া ধরাধামে শান্তির প্রবাহ বহাইয়া দিয়াছে। তন্মধ্যে যে সমাজ যতদূর উন্নত হইয়াছে, সেই সমাজ তদনুরূপ জীবন সংগ্রামের কঠোরতা ততদূর বিস্মৃত হইতে সমর্থ হইয়াছে।

বঙ্গেরও এমন একদিন ছিল, যখন বাঙ্গালীর নিকট জীবন-সংগ্রামের কথা আকাশ কুসুমবৎ প্রতীয়মান হইত, যখন বাঙ্গালী টাকায় আট মণ চাল উপভোগ করিয়াছে, যখন বাঙ্গালী অবাধে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া প্রাণ ভরিয়া "বার মাসে তের পার্ব্বণ" করিতে কিছুমাত্র কষ্টবোধ করিত না, যখন উৎসবে-আমোদে, বারোয়ারি, যাত্রা, পাঁচালী, কবির গান, চণ্ডীর গানে বাঙ্গালীর শান্তিময়ী পল্লিভূমি চির-মুখরিত হইয়া থাকিত। বঙ্গসমাজের সেদিন আর নাই, সেসব কথা বঙ্গের ইতিহাসের অঙ্কভুক্ত হইয়াছে, বৃদ্ধের নিকটও সে সব কথা এখন ঠাকুরমার গল্পের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। অবাধ প্রতিযোগিতার ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে পড়িয়া বঙ্গসমাজের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জীবন যাত্রা বিষম কষ্টকর ও ভাবিবার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূলভিত্তি শিথিল হইয়াছে।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণধর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্ত্তারমব্যয়ম্॥"

গীতার এই গম্ভীর বাণীর কোন সার্থকতা বঙ্গসমাজে আর পরিলক্ষিত হয় না। আজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সাম্যবাদের সূত্র অবলম্বন করিয়া স্ববৃত্তি বিস্মৃত হইয়া সমাজকে অবাধ প্রতিযোগিতার দিকে টানিয়া লইয়াছে। ব্রাহ্মণ যে কাজের জন্য প্রার্থী, শূদ্রও সেখানে অনায়াসে প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে; যে কাজ শাস্ত্রানুসারে শূদ্র ভিন্ন অন্য কেহ করিতে পারে না, ব্রাহ্মণও সেখানে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শূদ্রের সহিত সে কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না। পূর্ব্বে এক একটী জাতি তাহাদের নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিত; তাহার ফলে, এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকদিগকে কেবল-মাত্র সেই জাতির লোকের সহিত প্রতি-যোগিতা করিতে হইত, জীবিকা অর্জ্জনের উপায়ের জন্য অন্য জাতির সহিত কোন সম্পর্ক থাকিত না। এখন কিন্তু তাহা নাই,

জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সমগ্র বঙ্গসমাজ এখন এক হইয়া পড়িয়াছে। কেবল বঙ্গসমাজের কথাই বা বলি কেন,—নিভৃত বঙ্গভূমির দরিদ্র তন্তুবায় আজ সুদূর পাশ্চাত্য খণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতার আবর্ত্তে পতিত হইয়াছে, এইরূপ বঙ্গের অন্যান্য জাতিও সমগ্র পৃথিবীর সহিত অবাধ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, আমাদের জীবন-যাত্রাও যে বিশেষ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের শাস্ত্রকারগণ কখনও এইরূপ অবাধ প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন না। ত্রিকালদর্শী তাঁহারা,—তাঁহারা জানিতেন, সাম্যবাদের নীতি কখনও সমাজের *মঙ্গলদায়ক হইতে পারে না, তাই তাঁহারা* জাতিভেদের বিধান করিয়া গিয়াছিলেন, এবং সেই জাতিভেদ অনুসারে বৃত্তিভেদও করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহারা আরও জানিতেন, এই বৃত্তিভেদ যে দিন একাকারের দিকে অগ্রসর হইবে, সেইদিন সমাজেরও বিশেষ অনিষ্ট হইবে, তাই হিন্দুশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম-ভয়াবহ।"

হিন্দুর দৃষ্টি বরাবর পরমার্থিকের দিকে। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিলে কখনও পরমার্থিক উন্নতির দিকে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা প্রশমিত করিবার জন্য হিন্দু-সমাজে যে সকল প্রথা ও বিধিব্যবস্থা প্রচলিত আছে, বোধ হয়, সেরূপ আর কোন সমাজে প্রচলিত নাই। হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা নিষেধ সম্বন্ধে শাস্ত্রের স্থানে স্থানে যে সকল বিধি দৃষ্টিগোচর হয়, বোধ হয়, এই জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যেই অবাধ বাণিজ্যের পথে কুঠারাঘাত করিবার জন্য সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণের দ্বারা এইরূপ বিধি প্রণয়ন হইয়াছিল। জাতিভেদ অনুসারে বৃত্তিভেদও যে এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত—তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।

কালক্রমে এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বঙ্গের বহির্বাণিজ্যের পথ এখন পাশ্চাত্য জাতির আয়ত্তাধীন আছে; হিন্দু-শাস্ত্রের আদেশ তাঁহাদের প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে না, সুতরাং অবাধ বাণিজ্যের পথ এখন একেবারে মুক্ত; আর এদিকে সাম্যবাদের মোহনমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একের বৃত্তি অপরে কাড়িয়া লইয়া দেশের অন্তর্বাণিজ্যও আমরা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছি। ফলে, প্রতিযোগিতা বাড়িয়াছে, জীবন-সংগ্রাম অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, আর যে চাউল আট পয়সায় এক মণ পাওয়া যাইত, সেই চাউল এখন আট টাকায় এক মণ কিনিতে হইতেছে!!!

এখন এই ঘোর প্রতিযোগিতা কমাইতে *হইলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই সম্যক* চেষ্টা আবশ্যক। এদেশজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইবার সময় গভর্ণমেণ্ট যদি তাহার উপর অধিক হারে শুল্ক গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকে যদি শাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্ববৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে এই জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা হ্রাস হইবার আশা করা যায়।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

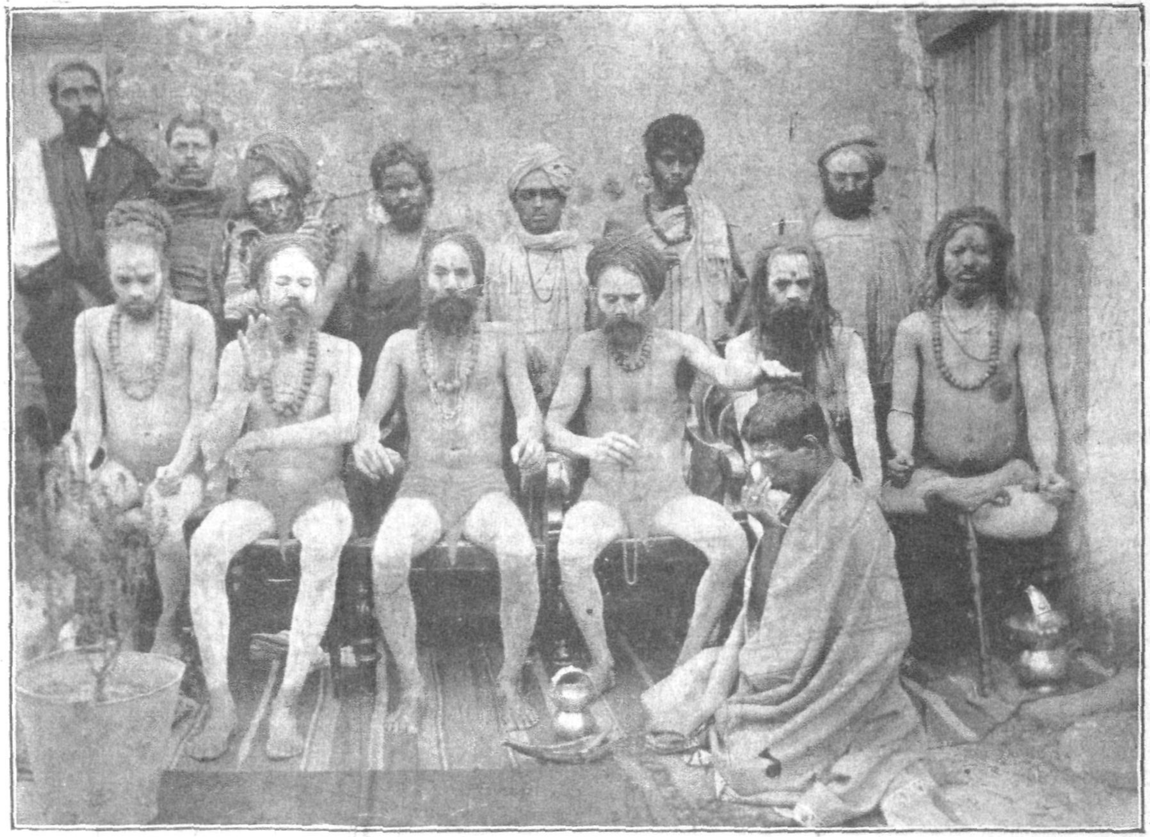
চীবর।—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল প্রণীত। একখানি সুবৃহৎ কবিতা গ্রন্থ, কলিকাতা ৩০।৩ মদন মিত্রের লেন দীনধাম হইতে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত, সুন্দর এণ্টিক কাগজে মনোহর ছাপা, এবং স্বর্ণাঙ্কিত মনোজ্ঞ বাঁধাই মূল্য ১৷০ আনা। বাঙ্গালা দেশে এখন আর কবিতার তাদৃশ আদর নাই—তাহার কারণ কবিপ্রতিভা লইয়া আজ কাল আর কেহ কবিতা রচনা করেন না বলিয়াই কবিতার প্রতি সাধারণে এত হতাদর। হৃদয়ে ভাবের লেশমাত্র নাই অথচ কোন একটী নামজাদা কবির কবিতার অনুকরণ করতঃ

কেবল অক্ষর গণনা করিয়া কবিতা রচনা করা হইল—এখনকার কবিতা রচনা। তাহার উপকরণ হইল—কোকিলের কুহুরব, চাঁদের চাঁদিমা, মলয় সমীরণ, রমণীপ্রেম—ইহাতে না ভাব, না ভাষা, যেন খিচুড়ী—কাজেই পড়িতে ভাল লাগে না। যে কবিতায় কবি-হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাস নাই, যাহাতে আন্তরিকতার অভাব, ধর্ম্মভাব যাহাতে পরিস্ফুট নহে—তাহা কখন পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না। তাই আজকাল কবিতার নামে সকলেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন। আমাদের আলোচ্য কাব্যের কবি—বঙ্কিমচন্দ্র কবিপ্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বাঙ্গালার হাস্যরসরসিক কবি স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের কৃতিপুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা যে সকলের প্রিয় এবং হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? আজকাল আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় সুমধুর এবং আন্তরিক ধর্ম্মভাব পূর্ণ কবিতা আর কাহার পাঠ করি নাই। তাহার কবিতায় ভাষা, ভাব ও কবিত্ব-শক্তির পূর্ণ-প্রভাব। আমরা যতবার ইহা পাঠ করি, ততবারই মুগ্ধ হইয়া যাই। এবং আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—যাহারা তাঁহার "চীবর" পাঠ করিবেন—তাঁহারাই মুগ্ধ হইবেন। বঙ্গদেশে এমন সরল, মধুর কবিতা আমরা আর কাহার পাঠ করি নাই। "চীবরে" যে কবিতাটী পড়িবেন, তাহাতেই হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে, কবিকে শত ধন্যবাদ না দিয়া কেহই থাকিতে পারিবে না। এই কাব্যের কবিতাগুলি এত মধুর এবং ধর্ম্মভাবপূর্ণ যে "আলোচনার" পাঠককে সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহার স্থানাভাব। আমরা প্রত্যেক ধর্ম্ম-পিপাসু পাঠককে এই পুস্তকের এক একখানি করিয়া ক্রয় করিতে অনুরোধ করি। যখন সংসার-দাবদাহে দগ্ধ হইয়া প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হইবে, সেই সময় ইহার এক একটী কবিতা তোমার সে যন্ত্রণা-বিদগ্ধ-হৃদয়ে অমিয়-মদিরা অভিসিঞ্চিত করিয়া পূর্ণানন্দ প্রদান করিবে।

মর্ম্মবাণী।—সাহিত্য বিষয়ক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় এবং অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, বার্ষিক মূল্য ৫৲ টাকা, কার্য্যালয় ২২নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, কলিকাতা। মর্ম্মবাণী তিন সপ্তাহ প্রকাশ হইতেছে। আমরা তিন সপ্তাহই নিয়মিত সময়ে পাইয়াছি। "মর্ম্মবাণী" অন্যান্য সংবাদ পত্রের ন্যায় পাঠান্তে ফেলিয়া দিতে হইবে না, পুস্তকাকারে বাঁধাইয়া রাখিতে পারা যাইবে। এই তিন সংখ্যা পাঠে যতদূর বুঝিতে পারা যায়—তাহাতে এই সাহিত্য বিষয়ক সংবাদ পত্রখানির দ্বারা বঙ্গভাষার উন্নতি ও পরিপুষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সম্পাদকদ্বয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং কৃতী লেখক। তাঁহাদের দ্বারা "মর্ম্মবাণীর" উন্নতির আশা করিতে পারা যায়। "মর্ম্মবাণী" নামটী অতি পরিপাটী হইয়াছে। এক্ষণে যা তা আবর্জ্জনায় ইহার কলেবর পূর্ণ না করিয়া হিন্দুর "মর্ম্মবাণী" যাবতীয় প্রাণের কথা, সাহিত্য ও ধর্ম্মের কথা ইহাতে স্থান পাইলে নামের সহিত কর্ম্মের সার্থকতা সম্পাদন করা হইবে। আমরা কৃতী-সম্পাদকমহোদয়গণের নিকট হইতে এইরূপ প্রবন্ধের আশা করি।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি।

জগতে যাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ—তিনি চির-জীবিত; বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তি বাঙ্গালীর নিকট চির-দেদীপ্যমান। ঘরে ঘরে তাঁহার প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, তাঁহার চির-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, তথাপি তদীয় ভক্তগণ সেদিন বাগবাজারে তাঁহার বার্ষিক স্মৃতি সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সভাপতি হইয়াছিলেন—আমাদের বঙ্গবাসী সম্পাদক, রায় সাহেব শ্রীবেহারীলাল সরকার মহাশয়। কবিবর—বেহারী বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণগাথা বিশেষ ওজস্বিতার সহিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।



হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরে সাধু-সম্মিলন।

BENGAL LIBRARY
SEP 30. 1915
WRITERS BUILDINGS

বিক্রমাদিত্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিক্রমাদিত্যের জন্ম।

হিন্দু রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নাম শত আদিত্যের জ্বলন্ত বিভায় উজ্জ্বলিত, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। হিন্দুর প্রধান শত্রু, ভারত মাতার হৃদয়ার্পিত বিষময় সুতীক্ষ্ণ শল্যস্বরূপ দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছদিগকে পরাস্ত ও উন্মূলিত করিয়া যিনি ভারতে শান্তি পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্বৎ আজিও হিন্দু পঞ্জিকাসমূহে অক্ষুণ্নভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, যাঁহার পবিত্র নাম আজিও প্রত্যেক হিন্দুর জপমালা,—বিদ্যার বিনোদনে ও বিক্রমের ব্যাখ্যাপনে লোকে যাঁহাকে আদর্শ বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়া থাকে, তিনি কোন্ সময়ে কোন্ দেশে উদ্ভূত হইয়া কাহার বংশ পবিত্র করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আজিও প্রমাণ্য ইতিহাস লিখিত হয় নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী যে কোন হিন্দু নরপতি শত্রু-সমরে অল্পবিস্তর জয়লাভ করিয়াছেন, তিনিই বিক্রমাদিত্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই-রূপে হিন্দু রাজমালায় আমরা বহু বিক্রমাদিত্যের নাম দেখিতে পাই। সেই বিশাল নামব্যূহ ভেদ করিতে যাইয়া মোক্ষমুলরের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী-দিগেরও বিশ্ববলিনী প্রতিভা বিতথ হইয়াছে। আদি বিক্রমাদিত্যের অনুসন্ধানে যাইয়া কুতর্কের কুটিল জালে জড়ীভূত হইয়া তাঁহারা এখনও বিষম অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের পদবী অনুসরণ করিলে বিক্রমা-দিত্যের ইতিহাস-সংকলন সুদূরপরাহত হইয়া পড়িবে,এই আশঙ্কায় আমি প্রাচীন গ্রন্থ সকলের অনুসরণে সম্বৎকার আদি বিক্রমাদিত্যের জীবনী পাঠকদিগের সম্মুখে স্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মহারাজ বিক্রমা-দিত্য প্রসিদ্ধ তুয়ারকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মহেন্দ্রাদিত্য *। উজ্জয়িনী ইঁহার রাজধানী। তুয়ারগণ কোন্ সময়ে উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করেন,—তাহা জানিবার উপায় নাই। ভট্ট সোমদেব বলেন,

* কথাসরিৎসাগর, ১২০ তরঙ্গ।

এই রাজার রাজত্বকালে ভারতে ম্লেচ্ছদিগের ভীষণ অত্যাচার আরব্ধ হইয়াছিল। রাজা মহেন্দ্রাদিত্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সেই অত্যাচার দূর করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, সেই ম্লেচ্ছদিগের অত্যাচারে দেবতারাও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাহার প্রতিবিধান-কামনায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত দেবদেব মহেশের নিকট গমন করিয়া ম্লেচ্ছদিগের ভয়াবহ অত্যাচার সম্বন্ধে কাতর বচনে বলিয়াছিলেন, "হে ঈশ্বর! আপনার ও ভগবান বিষ্ণুর অমিত বিক্রমে পূর্ব্বকালে যে সকল অসুর নিপাতিত হইয়াছিল, তাহারা আবার ম্লেচ্ছরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহারা সকলেই দেবদ্রোহী —ব্রহ্মহত্যা তাহাদের নিত্যব্রত; তাহাদের অত্যাচারে ভারতে যাগযজ্ঞ নিরস্ত হইয়াছে; হব্যকব্য রহিত হইয়াছে; সুতরাং দেব ও পিতৃলোক অনাহারে রহিয়াছেন। পরম কল্যাণকর বেদমন্ত্র আর কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহারা এতই পাষণ্ড যে, নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে ঋষিকন্যাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। অতএব হে প্রভো! শীঘ্রই ইহার প্রতিকারার্থ উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করুন;—ম্লেচ্ছদিগের বিনাশার্থ কোন মহাপুরুষকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে বলুন।"

মহাদেব দেবতাদিগকে মধুর বচনে আশ্বাসিত করিয়া বিদায় দিলেন এবং মাল্যবান নামে কোন গণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে পৃথিবীতে গমন করিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে মাল্যবান উজ্জয়িনীপতি মহেন্দ্রাদিত্যের মহিষীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইলে তিনিই বিক্রমাদিত্য নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্যের জন্ম সম্বন্ধে আরও নানাপ্রকার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে তৎসমুদায়ের সন্নিবেশ অনাবশ্যক ও অসম্ভব; তবে সেই সকলের মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য, এস্থলে সেইটীই প্রকটিত হইল। বিক্রমাদিত্য ধারাধিপতির দৌহিত্র। তাঁহার পিতার নাম গন্ধর্ব্বসেন। কথিত আছে, এই গন্ধর্ব্বসেন স্বরীশ্বর ইন্দ্রের পুত্র; পিতৃশাপে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন এবং শাপাবসানে স্বর্গে প্রতিগত হইয়াছিলেন। তিনি যৎকালে স্বর্গে প্রতিগমন করেন, তৎকালে এক দাসীর গর্ভে তদৌরসে ভর্ত্তৃহরি নামে এক পুত্র উদ্ভূত হইয়াছিলেন এবং বিক্রমাদিত্য তখন ধারারাজদুহিতার গর্ভমধ্যে ধীরে ধীরে পরিস্ফুরিত হইতেছিলেন। গন্ধর্ব্বসেন পৃথিবী পরিত্যাগ করিবার কালে গর্ভস্থ পুত্রের ভাবী গৌরবের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"সেই পুত্র সহস্র মত্তমাতঙ্গতুল্য বলশালী, সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ড প্রতাপবান্, পরম ধার্ম্মিক ও অদ্বিতীয় নীতিজ্ঞ হইবেন এবং পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবেন।" দৌহিত্রের এই অসীম ভাবী গৌরবের কথা শুনিয়া ধারাধিপতি শঙ্কিত হইলেন। বিক্রমাদিত্য যদি সমগ্র ভারতভূমির একেশ্বর হয়েন,তাহা হইলে ত তাঁহার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত ব্যাহত হইবে?—ধারারাজ বৃথা আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া দৌহিত্রের বধ-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন এবং সসত্ত্বা দুহিতার শয়নাগারের চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া তাঁহার প্রসব-

কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতার এইরূপ কঠোর অত্যাচার দর্শনে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া পতিশোকাতুরা রাজকুমারী ছুরিকা দ্বারা স্বীয় উদর বিদারণ পূর্ব্বক আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার গর্ভ তখন নয় মাস উত্তীর্ণ হইয়াছে; সুতরাং শিশু পরিস্ফুরিত অবস্থায় ভূমে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। প্রহরীগণ সেই সদ্যপ্রসূত শিশুকে লইয়া ধারারাজের সম্মুখে স্থাপন করিল। তাহার স্বর্গীয় সৌকুমার্য্য দর্শনে রাজা সকল বিদ্বেষ বিস্মৃত হইলেন এবং শিশুর সযত্ন লালন-পালনের নিমিত্ত তাহাকে মহিষীর হস্তে অর্পণ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না, এবং কন্যার শোকাবাহ আত্মহত্যা-বিবরণ শ্রবণ করিয়া আত্মগর্হনার সহিত অবিরত বিলাপ করিতে লাগিলেন *। এদিকে মাতামহীর অকৃত্রিম যত্নে শিশু বিক্রমাদিত্য শুক্লপক্ষীয় শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি ও পুষ্টি লাভ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল্য ও যৌবন।

জগতের প্রায় সকল মহাবীরগণেরই জন্ম অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ঐতিহাসিকগণ সেই নিবিড় তমিস্রা মধ্যে প্রবেশ করিয়া মূল রত্ন অনেক সময়ে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তাহার পারিপার্শ্বিক উপল খণ্ড লাভেই আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। মহাবীর বিক্রমাদিত্যের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমগ্র জীবনী এইরূপ গভীর তমোগর্ভে নিহিত। সেই অন্ধকারময় গহ্বর হইতে তদীয় প্রকৃত জীবনীর উদ্ধার করিতে চেষ্টিত হইয়া অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বিস্তর অবান্তর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে সেই মহাপুরুষের জীবনী অধিকতর দুর্জ্ঞেয় ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও চাণক্যের ন্যায় মহাবীরগণের জীবনচরিত অনেক পরিমাণে তাঁহাদিগের সমসাময়িক গাথাকারগণ কর্ত্তৃক গ্রথিত হইয়াছিল, কিন্তু বিক্রমাদিত্য তাঁহাদের বহু শতাব্দী পরে অবতীর্ণ হইলেও এবং তদানীন্তন ভারতের মহামহিমান্বিত পণ্ডিতগণে পরিবৃত থাকিলেও কোন সমসাময়িক ব্যক্তিই তাঁহার সেই পরম মনোরম লোকবিস্ময়কর জীবনচরিত গাথাবদ্ধ করেন নাই।

* এতদ্ব্যতীত বিক্রমচরিত, জনমেজয়-রাজবংশাবলী, প্রবন্ধ চিন্তাবলি, ভোজ প্রবন্ধ বিক্রমার্কচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের জন্ম ও অবদান সম্বন্ধে নানাবিধ বিবরণ দেখা যায়। বিক্রমচরিতে বর্ণিত আছে, উজ্জয়িনীরাজ প্রসেন নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হওয়াতে বিক্রমাদিত্য রাজসিংহাসনে স্থাপিত হয়েন। রবিপতি গুরুমূর্ত্তি নামক জনৈক দাক্ষিণাত্য ইতিহাসলেখক বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—বিক্রমাদিত্য চন্দ্রশর্ম্মা নামক কোন ব্রাহ্মণের পুত্র! ব্রাহ্মণ শান্তিময় জীবনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উজ্জয়িনীনগরে গমন করেন এবং তথায় মালবরাজ ধ্বজকীর্ত্তির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া অবশেষে তত্রত্য সিংহাসনেই অধিষ্ঠিত হয়েন। বিক্রমাদিত্যের বীরচরিত্র কেবল যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে, এমত নহে, ইংরেজী, জর্ম্মণী, ফরাসী—এমন কি মঙ্গোলিয় ভাষাতেও তাঁহার অবদান পরম্পরায় উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয়, কথাসরিৎ সাগর, পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের ন্যায় বিক্রমচরিত, দ্বাত্রিংশৎ সিংহাসন ও বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি গ্রন্থও ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় চালিত হইয়াছিল। "সেগাস্ ফ্রম দি ফার ঈস্ট" অর্থাৎ প্রাচ্য গাথামালা নামক একখানি ইংরেজী গ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের অনেক বীরকাহিনী একটিত আছে। তাহার কবিকল্পনা ও কথাবল্লীর কমনীন লতাপ্রতানের অভ্যন্তর হইতে অনেক ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধৃত হইতে পারে।

মাতামহীর পরম যত্নে লালিত হইয়া বিক্রমাদিত্য শৈশবেই স্বীয় মহনীয় ভবিষ্য জীবনের সূচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে দাসীগর্ভে তদীয় পিতার আর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ভর্ত্তৃহরি। ধারারাজ তাঁহাকেও স্বীয় দৌহিত্রের সহিত পরম যত্নে লালন-পালন করিতেন। বিক্রমাদিত্য ভর্ত্তৃহরিকে সোদরনির্ব্বিশেষে যত্ন করিতেন। উভয়ে সর্ব্বদা একত্রে থাকিতেন, এক সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইতেন ; এককালে একাসনে বসিয়া আহার করিতেন এবং একই-প্রকার বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেন। এইরূপে বিক্রম ক্রমে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে তদীয় মাতামহ ধারারাজ তাঁহাকে ভর্ত্তৃহরির সহিত গুরুহস্তে সমর্পণ করিলেন এবং নিজেও তাঁহাদিগের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, তাঁহাদের দুইজনকে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতুলপ্রতিভাশালী বিক্রমাদিত্য ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের নিকট সকল বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিলেন; কিন্তু ভর্ত্তৃহরি সেরূপ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিলেন না।

একে দৌহিত্র, তাহাতে সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, তরুণ বিক্রমাদিত্য সহজেই মাতামহের সমস্ত স্নেহ ও কামনা অধিকার করিয়া লইলেন। একদা ধারাধিপতি সভাস্থলে, সমবেত সচিবগণের সম্মুখে বিক্রমাদিত্যকে আহ্বান করিয়া সস্নেহে বলিলেন—"বিক্রম! আমি তোমাকে মালবদেশের সিংহাসনে অভিষেক করিলাম। দেখ, তৈলকণা যেমন জলের এক প্রদেশ স্পর্শ করিবামাত্র সমগ্র সলিলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, পুরুষসিংহগণ সেইরূপ পৃথিবীর যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াই অচিরকাল মধ্যে সমগ্র পৃথিবী আক্রমণ করিয়া থাকেন। তুমি পুরুষসিংহ; সুতরাং এই ক্ষুদ্র মালবরাজ্য হইতেই সমগ্র পৃথিবীর সাম্রাজ্য তোমার করতলগত হইবে।"

ধারারাজের এই পরম মনোরম বাক্যশ্রবণে বিক্রমাদিত্য আনন্দিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্র বচনে কহিলেন—"মহারাজ! আপনার প্রসাদলব্ধ বিষয় যৎকিঞ্চিৎ হইলেও যে পরিণামে আমি বিশালরাজ্য লাভ করিতে পারিব, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ ভর্ত্তৃহরি জীবিত রহিয়াছেন; জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্য-স্বীকার নিতান্ত অযৌক্তিক ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ; অতএব তাঁহাকেই আপনি মালবদেশের সিংহাসনে অভিষেক করুন, আমি মন্ত্রীরূপে তাঁহার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করি।" বিক্রমাদিত্যের এই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ দর্শনে সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। অতঃপর ভর্ত্তৃহরিই মালবদেশের আধিপত্যে অভিষিক্ত হইলেন; বিক্রম তাঁহার মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া রাজকীয় সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট শাসনগুণে উজ্জয়িনী স্বল্পদিনের মধ্যেই শ্রীবৃদ্ধির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিল, এবং সমস্ত প্রকৃতিবর্গ পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ সচিবোচিত কার্য্যের নিমিত্ত বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহা অপেক্ষা শতগুণে গুরুতর

কর্ত্তব্য তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভবিতব্যতার কঠোর ও অলঙ্ঘ্য নিয়মে সেই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের কাল ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজা ভর্ত্তৃহরির দুই পত্নী—জ্যেষ্ঠা অনঙ্গা; কনিষ্ঠা পিঙ্গলা। কথিত আছে, অনঙ্গার রূপ-লাবণ্য ও কামকলা-কৌশলে তিনি এতদুর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সর্ব্বদা অন্তঃপুরেই কালহরণ করিতেন; রাজ্যশাসন ব্যাপারে আদৌ তাঁহার মন ছিল না। এতদ্দর্শনে বিক্রমাদিত্য অতীব বিরক্ত হইলেন এবং একদা সভাস্থলেই তাঁহাকে মৃদুমধুর ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন—"আপনি তুচ্ছ ললনাবিলাস পরিত্যাগ করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করুন।" এই পরম মনোরম হিতবাক্য ভর্ত্তৃহরির কর্ণে যেন বিষ বর্ষণ করিল। তিনি সরোষে বলিলেন—"বিক্রমাদিত্য! তুমি আমার নিকটে আর আসিও না; আমি তোমাকে দেখিতে চাহি না।" জগতে স্বার্থ-ত্যাগ ও পরোপকারের এইরূপ পরিণাম! উজ্জয়িনী রাজ্যের ন্যায়সম্মত অধিকারী হইয়া এবং মাতামহের নিকট প্রাপ্ত হইয়াও বিক্রমা-দিত্য স্বেচ্ছায় যাহা জনকের দাসীপুত্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন, যাঁহাকে তিনি যথার্থ জ্যেষ্ঠের ন্যায় ভক্তি করিতেন, তাঁহার এই ব্যবহার! বিক্রমাদিত্যের হৃদয় আলোড়িত হইল; জগতে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা নাই। তিনি রাজসম্মানে শতধিক্কার প্রদান করিয়া উজ্জয়িনী হইতে বিদায় লইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে সমগ্র মালব রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারিতেন, কিন্তু সেরূপ কাপুরুষোচিত কার্য্যের সামান্য কল্পনা মাত্রও তাঁহার বীরহৃদয়ে উদিত হইল না; প্রবল ভাগ্যতরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া কৃতঘ্নতার নামে ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুর্জ্জরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মন্ত্রিগণ ও প্রজাবর্গ তাঁহার জন্য মর্ম্মাহত হইয়া রহিল। সেই কঠোর সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাহারা তাঁহাকে বারম্বার অনুরোধ করিলেও তিনি তাহাদের কোন কথাতেই আস্থা প্রদর্শন করিলেন না। ভারতের ভাবী উদ্ধারকর্ত্তা আজি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় ও নিরবলম্বভাবে দুরদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজা নীলাম্বর।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গৌড় নগরে।

গৌড় নগরে সৌধাবলীর উচ্চচূড়া সূর্য্যের অস্তগামী রক্তবর্ণ কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠি-য়াছে। নানা বর্ণের পতাকা বায়ুতে হেলিয়া দুলিয়া আনন্দোৎসবের পরিচয় দিতেছে। পুষ্প-মালা প্রতি বাতায়নে শোভা করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগের আনন সেই সব পুষ্পের মধ্য দিয়া উঁকি মারিতেছে, তখন ভ্রম হইতেছে পুষ্প বা মুখখানির মধ্যে কোনটী অধিক সুন্দর দেখায়। অপরাহ্নে, রবি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া গৃহে যাইতেছেন, সেই

সময় একবার শেষ হাসি হাসিয়া লইলেন, সেই হাসিতে সকলেই হাসিতে লাগিল। নগরের রাস্তা আজ বড় পরিষ্কার, দুই ধারে কদলী বৃক্ষের শোভা, তাহাতে আম্রপল্লব ঝুলিতেছে, মধ্যে মধ্যে নানা বর্ণের ফুল শোভা পাইতেছে। এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ পথিক নগরে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহাকে দেখিলেই অনুমান হয় তিনি এ স্থানে অপরিচিত, রাত্রিকালে কোথায় যে যাইবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। হঠাৎ বাদ্যোদম হইল, একজন অশ্বারোহী সৈন্য তালে তালে নাচিতে নাচিতে সহরে প্রবেশ করিল। পথিক এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, দেখিতে দেখিতে রাস্তার দুইধারে অসংখ্য লোক দাঁড়াইল। অশ্বারোহীদের পশ্চাৎ হস্তী পৃষ্ঠে কয়েকজন লোক আসিল, তৎপর একটি প্রকাণ্ড দ্বিরদ পৃষ্ঠে স্বয়ং বাদসাহ হোসেন সাহ প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বলবান পাঠান শরীররক্ষক। সে হস্তিটীর অপূর্ব্ব শোভা, স্বর্ণ দ্বারা দন্ত বাঁধান, সুবর্ণখচিত আসন, মধ্যে মধ্যে মূল্যবান মুক্তা বসান, সেই আসনে বাদসাহ উপবেশন করিয়াছেন। একটী স্বর্ণ শৃঙ্খল হস্তীর পশ্চাৎ হইয়া পৃষ্ঠদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছে। বাদসাহ অপূর্ব্ব পরিচ্ছদে সজ্জিত, বহুমূল্য প্রস্তর পোষাকের স্থানে স্থানে জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে, মস্তকে একটী বহুমূল্য পাগড়ী, মধ্যস্থলে উজ্জল হীরক কিরণ বিকীরণ করিতেছে। দক্ষিণ দিকে একখানি ক্ষুদ্র অসি, বামদিকে একটী পিস্তল। বাদসাহ সহাস্যবদনে সকলের সেলাম গ্রহণ করিতেছেন। রাস্তার লোকে লোকারণ্য, বৃদ্ধ পথিক একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি কে?" সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—"তুমি কি গৌড়ের বাদসাহকে চিন না? কোথায় তোমায় ঘর?" বৃদ্ধ আর উত্তর না করিয়া ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

ক্রমে বাদসাহের হস্তী পথিকের নিকটবর্ত্তী হইল, পথিক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"জয় বাদসাহ সাহেবের জয়।" বাদসাহ সেইদিকে দৃষ্টি করিলেন, তিনি দেখিলেন একজন বৃদ্ধ পথিক দুই হস্ত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। তিনি হস্তী থামাইয়া একজনকে আদেশ করিলেন যে বৃদ্ধকে যেন বাদসাহ-মঞ্জিলে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি চলিয়া গেলেন, রাস্তার লোকেরা গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

রজনীযোগে বাদসাহ হোসেন সাহ একটী সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জাঁহাপনার সঙ্গে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে চায়। বাদসাহ আদেশ করিলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় প্রবেশ করিলেন, এবং আদেশানুসারে একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। হোসেন সাহ বলিলেন—"আপনি কে? কি চান? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আমি রংপুরের রাজা নীলাম্বরের প্রধান মন্ত্রী, আজ আপনার আশ্রয়ে এসেছি।" এই কথা শুনিয়াই বাদসাহের একটী আশা হৃদয়ে জাগরিত হইল, তিনি সতর্ক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি হিন্দু, আপনার মনিব হিন্দু, তবে আমার আশ্রয়ে কেন? বৃদ্ধ বলিলেন—হুজুর। আমি নিরুপায় হ'য়ে আপনার নিকট এসেছি। রাজা

নীলাম্বরের অত্যাচারে আর রাজ্যে বাস করা কঠিন। বিশেষতঃ আমার প্রতি ভয়ানক অত্যাচার হচ্চে। আমার একমাত্র পুত্রকে বিনা দোষে প্রাণদণ্ড ক'রে, সেই মাংস আমাকে আহার কত্তে দিলেন। ইহাপেক্ষা ভীষণ কার্য্য আর কি আছে? প্রজারা সকলেই অসন্তুষ্ট, এমন কি সভাসদেরা সকলেই তাঁর বিপক্ষ। আপনি যদি একবার সসৈন্যে ঐ রাজ্য আক্রমণ করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার জয় হবে। প্রজারা আপনাকে আশীর্ব্বাদ করবে, আমি হাত তুলে আপনার দীর্ঘজীবনের জন্য আশীর্ব্বাদ করবো। আমি ত সামান্য মানব, স্বয়ং ঈশ্বর আপনাকে আশীর্ব্বাদ করবেন। আপনি প্রস্তুত হউন, এরূপ অত্যাচারীর হাত থেকে প্রজাদিগকে উদ্ধার করুন।" হোসেন সাহার অনেক দিন হইতে রংপুর হিন্দুরাজ্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি, কিন্তু দিল্লীর বাদসাহের সঙ্গে সর্ব্বদা গোলযোগবশতঃ ও অন্যান্য কারণে এত দিন ঐদিকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। এখন চমৎকার সুযোগ উপস্থিত, স্বয়ং মন্ত্রী তাঁহার শরণাগত, তিনি উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "রাজা নীলাম্বরের আমরা সুনাম শুনেছি। তিনি প্রজাবৎসল, সদ্বিচারক, এইরূপ আমাদের গুপ্তচরেরা জানিয়া আসিয়াছে, এ অবস্থায় প্রজারা নিশ্চয়ই তাঁহার পক্ষভুক্ত থাকিবে। তবে আমি যুদ্ধকে ভয় করি না, সামান্য একজন হিন্দু রাজাকে জয় করলে বঙ্গদেশে রাজত্ব করতে পারবো না। আপনি এখানে থাকুন, আমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হব। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। এই রাজ্য জয় হ'লেই আপনাকে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত ক'রে চ'লে আসবো। এইবা'র আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন দেখছি। এই কথার পরেই একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"এই ব্রাহ্মণকে নিয়ে যাও, আহার ও বাসস্থানের ভাল আয়োজন ক'রে দিও। কোন বিষয়ে যেন ক্রটি হয় না।" ভৃত্য সেলাম করে বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিল। হোসেন সাহ মনে মনে হাসিলেন—তারপর অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"খোদা আমার উপর সদয়, নইলে এমন সুযোগ ঘটবে কেন? আগে রংপুর জয় করি, তারপর সমস্ত আসাম জয় ক'রে আমার রাজ্যভুক্ত করবো। দেখি কতদূর কি হয়। দিল্লীর অধীনতা আর রাখবো না, নিজে স্বাধীন হ'য়ে এই পূর্ব্বখণ্ডে রাজত্ব করবো। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে স্তোক বাক্য দিয়েছি, কোনরূপে রংপুর জয় হ'লে আর তাকে আসতে দিব না। যে পুরাতন মনিবের নিকট বিশ্বাসঘাতক, সে আমার নিকট বিশ্বাসঘাতক হবে আশ্চর্য্য কি? এরূপ লোক রাজ্যে বাস থাকতে দিব না। যতদিন কার্য্যোদ্ধার না হয়, ততদিন এ লোকটাকে হস্তগত রাখতে হবে।" এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাকর্ষণ হইল, তিনি উঠিয়া অপর কক্ষে গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সদুপদেশ।

রাণী অনেক দূর অগ্রসর, অন্ধকার রাত্রি, তবে নক্ষত্রালোকে কিছু কিছু দেখা যাইতেছে।

এই সময়ে ভুবনেশ্বরী রাজবাটীর পশ্চাতের উদ্যানে একাকিনী বসিয়া আছে। তাহার নিদ্রা নাই, চক্ষুদুটী রক্তবর্ণ, ওষ্ঠ মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইতেছে। কেশগুলি পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া আছে, তাহাতে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভুবনেশ্বরী কি ভাবিতেছে? দেবদাস তাহার হাতের অস্ত্র ছিল, সেখানি যে কি হইল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। বৃদ্ধ মন্ত্রীকে সে উত্তেজিত করিয়া দিয়াছে, এবং সেই রাত্রেই মন্ত্রী কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। এই ঘটনা আশাপ্রদ সম্ভবতঃ বৃদ্ধ গৌড়নগরে গিয়াছে। তাহা হইলে অচিরাৎ ফল ফলিবে। ভুবনেশ্বরী দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"জীবনের ব্রত প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! দেখি কি হয়। দেখ্‌বো! দেখ্‌বো! দেখ্‌বো। এত অত্যাচার! কত ফাঁদ পাত্‌লেম, সফল হ'তে পারলেম্ না, এই বার যে ফাঁদ পেতেছি, তাতে আর উপায় নাই। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!" এই সময়ে মধুর স্বর তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। রাত্রিকাল, এরূপ নির্জ্জন স্থান, ভুবনেশ্বরী চমকিয়া উঠিল, সে মনে করিল কোন দেববালা গান করিতেছে। আসামে এখনও পর্য্যন্ত এই সব বিশ্বাস আছে, সে সময়ে ভুবনেশ্বরী যে বিশ্বাস করিবে আশ্চর্য্য কি? সঙ্গীত অতি মনোহর—ভুবনেশ্বরী চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

"ওমা তোর মায়া কে বুঝ্‌তে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে মায়া দিয়ে,
রেখেছ সব পাগল করে।
মায়াভরে এ সংসারে,
কেহ কারে চিন্তে নারে,
ঐ যে এম্নি কালীর কাপ আছে যে
যেম্নি দেখে তেম্নি করে।"

ভুবনেশ্বরী দেখিল সঙ্গীত-লহরী ছড়াইতে ছড়াইতে কে একজন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ভুবনেশ্বরী ভান করিয়া দৃষ্টি করিল—জটাজুট ধারিণী সন্ন্যাসিনী—হাতে ত্রিশূল—স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভুবনেশ্বরী ভাবিল কোন দেববালা, সে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসিনী আশীর্ব্বাদ না করিয়াই বলিলেন—"প্রতিহিংসা রাক্ষসের—প্রতিহিংসা পিশাচের—প্রতিহিংসা দেবতাদের নয়। তুমি কি নরকে ডুব্‌বে? এখনও পূর্ব্ব কথা ভুল্‌তে পার নাই? এত ষড়যন্ত্র কেন? জান্‌বে যে হিংসাবৃত্তি সর্ব্ব নিকৃষ্ট—এ বৃত্তির প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন? দেখ্‌তে পাচ্ছ দেবদাসের পরিণাম কি হ'ল? তুমি ত কত মন্ত্রণা কর্‌লে, একটাও ত সফল হ'ল না? আবার শেষ মন্ত্রণা—ভীষণ মন্ত্রণা—স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌তে প্রস্তুত হ'য়েছ, তাতে কত দুর কৃতকার্য্য হবে কে জানে? এসব ছেড়ে একবার "মা মা ব'লে ডাক, ভবযন্ত্রণা দুর হবে, মনের শান্তি পাবে। এই যে অশান্তিতে সদা বাস কচ্ছ ইহা কি ভাল? শান্তি লাভের চেষ্টা কর, মায়ের কোলে যেতে চেষ্টা কর। মা ত জগতের প্রাণীর জন্য বাহু প্রসারণ ক'রে রয়েছেন, যার ইচ্ছা কোলে যেতে পারে। মা মা বলে সেই কোলে গেলে কত শান্তি! একবারও কি তা বুঝ্‌লে না? যদি না বুঝ, তবে পরিণাম ভাল নয়। যে ছুরিকা অন্যের স্কন্ধে

বিদ্ধ কর্‌তে চাও, সেই ছুরি তোমার স্কন্ধে বিদ্ধ হবে। এখনও সময় আছে, এখনও সাবধান হও। আমি তোমাকে সাবধান কর্‌তে এসেছি যদি না শুন, ফলভোগ কর্‌বে। আমি যাই, এখনও পরিণাম ফল চিন্তা কর।"

দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসিনী অন্তর্হিত হইলেন। এতক্ষণ ভুবনেশ্বরী চিত্রার্পিতের ন্যায় ঐ সব কথা শুনিতেছিল, সন্ন্যাসিনীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চৈতন্য হইল, সে তাড়াতাড়ি উঠিল সন্ন্যাসিনীর অনুসরণ করিবে, ইচ্ছা হইল—কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন আবার আসিয়া বসিল। ভুবনেশ্বরী কিছু স্থির করিতে পারিল না, সে একবার মনে করিল দেববালা, নতুবা এত কথা কি প্রকারে জানিতে পারিবে, আবার ভাবিল শত্রু-পক্ষীয় কেহ হইবে, কোন কৌশলে সব জানিতে পারিয়াছে। ভুবনেশ্বরী সমস্ত রাত্রি উদ্যানে বসিয়া থাকিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হোসেন আলি।

নিশি প্রায় অবসান, অন্ধকার ঘুচিয়া আলো প্রকাশ পাইতেছে—নক্ষত্রগুলি ম্লানমুখে বিদায় গ্রহণ করিতেছে—অস্পষ্ট আলোকে বৃক্ষরাজি ভীম অসুরের ন্যায় দেখাইতেছে। এমন সময়ে তিনটী লোক চুপে চুপে রংপুরের সন্নিকটস্থ ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিল। তিনজনের শ্বেত পোষাক, তিনজনেরই দেহ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত, এবং প্রকাণ্ড উষ্ণীষ তাহাদের মস্তকে শোভা পাইতেছে। ইহাদের নেতা সর্ব্বাগ্রে চলিয়াছে, পশ্চাতে পশ্চাতে দুজন লোক যাইতেছে। নেতা হোসেন আলি, অপর দুটি তাহার ভ্রাতা। তিনজনে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর হোসেন আলি বলিল—"এখন কি কর্ত্তব্য, আমরা ত রাজধানীর নিকটে এসেছি।" একজন উত্তর করিল—"ভাই! আমরা বাদশাহের লবণের গুণ রাখ্‌বো। তাঁর কাজ কর্‌বোই।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—"ভাই! আমাদের মায়ের কিন্তু সে অভিপ্রায় নয়, তিনি বলেন যে রাজা নীলাম্বর আমাদের চিরকালের রাজা, তাঁহার অনিষ্ট করা কর্ত্তব্য নয়। তোমরা যে দিকে যাবে আমি সেই দিকে যাবো। তবে ইহাও বিবেচনা করা দরকার, পরিণাম কি হবে।" হোসেন আলি ক্রোধ করিয়া বলিল—"রেখে দে তোর রাজা, কাফের আবার রাজা কিসের? আমরা বাদশাহের দরমাহা খাচ্ছি, বাদশাহের কাজ কর্ব্বো। তোরা যদি ভাল চাস্, আমার সঙ্গে যোগ দে, ভয় পাস্, এখনও সময় আছে চ'লে যা! আমি কাহারও সাহায্য চাই না, আমি একাকী কার্য্য সাধন কর্‌তে পার্‌বো।" তখন দুই ভাই সমস্বরে বলিল—"আমরা তোমার সঙ্গেই থাক্‌বো, তুমি যে স্থানে যাইবে, আমরাও সঙ্গে যাবো।" হোসেন আলি সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"কার্য্য প্রায় উদ্ধার, কোন ভাবনা করো না, আমার সঙ্গে থাক, দেখ্‌বে কি ফল ফলে। কত জহরত, আস্‌রফি বকশিস্ পাবে।" এইভাবে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, এমন সময়ে কে একজন যুবক তথায় আগমন করিল। তাহাকে দেখিয়াই হোসেন

আলি বলিল—"আসুন, আসুন, আপনার আদেশেই এখানে এসেছি। এখন কি কর্‌বো বলুন।" যুবকটি একটু দূরে উপবেশন করিল, তারপর বলিল—"তোমরা এসেছ সন্তুষ্ট হ'য়েছি, এর পুরস্কার পাবে। আর দুজন কোথায়?" হোসেন আলি বলিল—"তারা বাড়ীতে আছে, কাজের সময় আস্‌বে। বিশেষতঃ আমরা তিন জনে যদি পারি, তবে আর তাদের দরকার কি?" যুবক বলিল—"হোসেন আলি! কার্য্য বড় কঠিন। অতি সাবধানে চল্‌তে হবে। মন্ত্রী বাদশাহের নিকট নিশ্চয়ই গিয়াছেন, এখন বাদশাহের কি মত হবে জানি না। যদি তিনি এই রাজ্য আক্রমণ করেন, তবে আমি অনেক গুপ্ত সন্ধান দিতে পার্‌বো। এ স্থানের সৈন্যেরা সব অসন্তুষ্ট, তাদের কতক বাদশাহের পক্ষে আন্‌তে পার্‌বো। আর যদি বাদশাহ না আক্রমণ করেন, তবেই অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে।" হোসেন আলি বলিল—"যদি বাদশাহের আসার পূর্ব্বে আমরা কার্য্যোদ্ধার করতে পারি, তবে ত আরও সুবিধা, সেই উপায় করুন না কেন?" যুবক বলিল—"যদি অকৃতকার্য্য হও তবে কি হবে?" হোসেন আলি উত্তর করিল—"তা হ'লেই বা লোকসান কি?" যুবক হাসিয়া বলিল—"লোকসান এই যে সকলে ধরা পড়ে—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে।" হোসেন আলি ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ধরে কে?" যুবক বলিল—"সে সাহস তোমাদের আছে?" হোসেন আলি বলিল—"আছে বই কি? আমরা কি না কর্‌তে পারি?" যুবক বলিল—"তবে আজ সন্ধ্যার পর প্রস্তুত থাক্‌বে, আমি তোমাদিগকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। তোমাদের সঙ্গে কি অস্ত্র আছে?" হোসেন আলি বলিল—"তরবারি আছে।" যুবক হাসিয়া বলিল—"এ সব অস্ত্রে কিছু হবে না।" এই বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী পিস্তল বাহির করিয়া হোসেন আলির হস্তে দিয়া বলিল—"হোসেন আলি! এই ব্রহ্মাস্ত্র লও, ইহাদ্বারা কার্য্যোদ্ধার কর্‌তে হবে। সমস্ত দিন এই বনে থাক্‌বে, বাহিরে যেও না। রাত্রে আমি এসে সঙ্গে ল'য়ে যাবো, তারপর আমার উপদেশানুসারে কার্য্য করবে। যদি অকৃতকার্য্য হও, তবে তৎক্ষণাৎ পলায়ন কর্‌বে, নতুবা তোমাদের জীবনের জন্য দায়ী আমি হবো না। আমি নিকটেই থাক্‌বো, কিন্তু আমাকে কেহ ধর্‌তে পার্‌বে না। এই কার্য্যের পুরস্কার বহু মুদ্রা, এক্ষণে আমি এই স্বর্ণালঙ্কার তোমাদিগকে দিলেম, ইহাতে হীরক আছে, ইহার মূল্য অনেক টাকা। কার্য্য শেষ হ'লে যথেষ্ট পুরস্কার পাবে, বাদশাহও তোমাদিগকে বড় পদে বসাবেন। এ রাজ্য ত বাদশাহের হবেই। এখন বিশ্রাম কর, আমি যাই।" দ্রুতবেগে যুবক চলিয়া গেল, উহারা তিনজনে সেই বনমধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিল।

শ্রীঅমলানন্দ বসু।

সাহিত্যের প্রভাব।

জগতের যাবতীয় সভ্য জাতি-সমূহের উত্থান পতনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে সাহিত্য-পুষ্টিই জাতীয় উন্নতি ও

অবনতির মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে। সাহিত্যই জাতীয় জীবনকে গঠিত করিয়াছে। সাহিত্যে যখন যে ভাবের স্রোত বহিয়াছে, একটী জাতি বা সমাজও তখন সেই ভাবের তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে। একটা জাতীয় জীবনের জোয়ার ভাটা সাহিত্যের উপরেই যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। অসৎ-সাহিত্যের প্রভাবে যেমন জাতীয় অবনতি ঘটিয়াছে, সৎ-সাহিত্যের প্রভাবেও তেমনি জাতীয় জীবনে উন্নতির সাড়া পড়িয়াছে। সাহিত্যের মাপকাটিতেই আমরা বুঝিতে পারি, একটা জাতির গতিবিধি কোন দিকে।

জাতীয় অভ্যুত্থানের সময়ে, সাহিত্য এবং ভাষার মধ্যে একটা নবশক্তির জাগ্রত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্যিকগণের ভাব ও ভাষায় তখন একটা নব অনুপ্রেরণা ও অসাধারণ শব্দ-শক্তিমত্তা যেন ফুটিয়া উঠে। জাতীয় অধঃপতনের কালে সাহিত্য বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নীচাশয়তা এবং ক্ষুদ্রতা দ্বারাই তখন সাহিত্য গঠিত হয়। অধঃপতন কালের সাহিত্যিকগণের মস্তকে কোনরূপ মহতী কল্পনা স্থান পায় না, কেবল ক্ষুদ্র গল্প, ক্ষুদ্র কবিতা ও প্রহসনই জন্মায়।

বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন চিরদিনই নিম্নাভিমুখগামী, চিরদিনই উত্থান-শক্তিহীন জড়তা ও ঘুমঘোরে কাতর। সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালীর জাতীয় ধমনীতে সাড়া কোন দিনই পড়ে নাই। জাগ্রতাবস্থার সুযোগ আমাদিগের জীবনে কোন দিনই আসে নাই। সময়ে সময়ে কদাচিৎ দুই একটী সাহিত্যিক আমাদিগের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। তাঁহারা যখন আবির্ভূত হন, তখন আমরা স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হই, তাঁহাদিগের তিরোধানে আবার আমরা ঘুমাইয়া পড়ি। প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস হইতে এ যুগের হেমচন্দ্র পর্য্যন্ত কত কবি জাগাইবার সাড়া তুলিয়াছিলেন, কত শিঙ্গা বাজাইয়াছিলেন, কত বিলাপ করিয়াছিলেন, কত ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা চিরদিনই এই সব জাগ্রত করিবার অগ্রদূতদিগের বংশী, শঙ্খ এবং শিঙ্গা কিছুতেই কর্ণপাত করি নাই।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের গতিও সেই স্বপ্নাবস্থা লইয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। আমরা অঘোরে ঘুমাইতেছিলাম—হঠাৎ সাহিত্যের ভিতর দিয়া নবজীবনের স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নের ভিতরেও সাড়া পড়িয়া গেল। হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকগণ বাঙ্গালীর স্বপ্নাবস্থার মধ্যেও সাড়া দিয়া উঠিলেন। সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি আবার মহাকাশে গিয়া মিলাইল। সে উৎসাহ, সে উদ্দীপনা, সে সহযোগিতার ভাব বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে নিমিষে নিঃশেষিত হইল।

বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা আবার ভাটার টানে নিম্নগামী হইতে বসিয়াছে। হেমচন্দ্র প্রমুখ পূর্ব্বাচার্য্যগণ বাঙ্গালার শ্মশান-ক্ষেত্রে হঠাৎ বন্যার জলের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তিরোধানে আবার বঙ্গ-সাহিত্যের চিতা-শয্যায় বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যের আদর্শ ক্রমশঃই বিকৃত ভাব ধারণ করিতেছে।

পাশ্চাত্য নভেলিয়ানার আবহাওয়ায় পড়িয়া বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রও আপনার মতি গতি স্থির রাখিতে পারেন নাই। তিনিও যেন অনুকরণ প্লাবনে,পাশ্চাত্য কুরুচির বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছিলেন। এইজন্যই কবিবর নবীনচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন—"বঙ্কিম বাবু আদর্শ কুল-রমণী গড়িতে পারেন নাই, তাঁহার প্রত্যেক রমণীচিত্র পাশ্চাত্যভাবব্যঞ্জক। ইহাদের কোনটীকেই আমাদের আদর্শ কুলবধূ-রূপে বরণ করিয়া লইতে পারি না।" এতদ্ভিন্ন বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলিতে মুসলমানদিগের প্রতি এবং মুসলমান রমণীদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত ও বহু অবিচার দৃষ্ট হয়। তাঁহার ন্যায় ঋষিকল্প ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ একদেশ দর্শিতা আদৌ শোভনীয় নহে। তিনি কেবল মুসলমান রমণী চরিত্র কলঙ্কে অঙ্কিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আর তাঁহার হিন্দুনারীর চরিত্র-গুলিও আমাদিগের অন্তঃপুরের অনুরূপে গঠিত হয় নাই। তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমাদিগের সমাজ এবং অন্তঃপুর কতটা উপকৃত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে ভাবিবার বিষয়। তাঁহার বিষবৃক্ষ আজ সত্য সত্যই বঙ্গের ঘরে ঘরে বিষবৃক্ষের সৃজন করিয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারত যে সমাজকে অদ্যাবধি গঠিত করিয়া আসিতেছে, হায়। তাহাতে কেন আজ বিদেশীয় নভেলীয়ানার বিষ ক্রমশঃই ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। বঙ্কিমবাবু হইতেই বঙ্গে বিলাতী নভেলীয়ানার প্রথম আরম্ভ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তাহার পর রবীন্দ্রনাথ। ইনি হিন্দুকে চৌদ্দ আনা ব্রাহ্ম করিয়া ফেলিয়াছেন। আজ-কাল ঘরে ঘরে কমলার অভাব হইয়া পড়িয়াছে বটে, হিন্দু—হিন্দুই আছে, ভিন্ন মতাবলম্বী হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ কবীন্দ্র বলিয়া আধুনিক সমাজে পরিচিত। কতকগুলি পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী হিন্দুর ছেলে, ঠিক না হউক কতক পরিমাণে তাঁহাকে অনুকরণ করিতে গিয়া সাহিত্যের অপকর্ষ সাধন করিতেছে, বাঙ্গালা-সাহিত্যের দুর্দ্দশার একশেষ করিতেছে। সাহিত্যই সমাজকে উন্নত করে, আবার সাহিত্যই সমাজকে রসাতলে দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে কতটা উন্নত করিয়াছেন এবং কতটা অধঃপাতে দিয়াছেন, তাহা যাঁহা-দিগের মোহের অবস্থা, এক্ষণে ধরিতে পারিবেন না, ইহা, আমাদিগের পরবর্ত্তী যুগের বংশধর-গণের বিবেচ্য এবং বিচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর বিশেষত্বকে একেবারে কর্ম্মনাশা জলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। আধুনিক যুগের অবতার রবীন্দ্র-নাথ উদারতা ও বিশ্বমানবতা দেখাইতে গিয়া এই ভিক্ষাজীবী এবং দাসত্ব-প্রিয় বাঙ্গালী-জাতিকে আর এক নূতন ফাঁদে জড়াইয়াছেন। বাঙ্গালীর অচলায়তন ভাঙ্গিতে গিয়া কবি সম্রাট এই অদূরদর্শী বাঙ্গালীর চৈতন্য সম্পাদন করিতে না পারিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। তাহারা বুদ্ধিদোষে ভিন্নপথে গমন করিয়া ইতো-নষ্ট ততোভ্রষ্ট হইয়াছেন। কেবল ইনি নহেন, এইরূপ কত শত ক্ষুদ্র গল্প লেখক, ক্ষুদ্র গীতি কবিতা রচয়িতা বাহির হইতেছে, যাহারা কেবল এই ত্যাগের দেশে ভোগের বীজ

ছড়াইতেছেন। ইহাদের না আছে আদর্শ, না আছে উদ্দেশ্য। কেবল আত্মতৃপ্তির জন্যই সাহিত্য-সাধনা নহে। মহাভারত রামায়ণ কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য রচিত হয় নাই। সমাজ এবং পরহিতার্থেই আমাদিগের প্রাচীন সাহিত্যিকগণ জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়া গিয়াছিলেন। রামায়ণ মহাভারত সমাজকে গঠিত করিয়াছিল, এখনও গঠিত করিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্য যে সমাজকে অধঃপাতে দিতেছে, হিন্দুর অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিতেছে।

যাহা হউক, এই নভেলী যুগ চিরদিনের নয় —ইহার ধ্বংস অনিবার্য্য! আত্যন্তিক অভাব দৃষ্ট হইলেই এই বিলাস-সাহিত্যেরও অবসান ঘটিবে। আজ যাহা নূতন বলিয়া ঠেকিতেছে, কাল তাহা পুরাতন হইয়া যাইবে। তখন সাহিত্যক্ষেত্রে এক নূতন আদর্শ ও নূতন উদ্দেশ্যের বীজ রোপিত হইবে। ত্যাগ এবং কল্যাণকে মূলমন্ত্র করিয়া ভারতের সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল, সমাজও গঠিত হইয়াছিল। আবার এই নভেলের নেশা ছুটিলে সাহিত্য আদর্শ ও উদ্দেশ্য মূলক হইবে। তখন সাহিত্যে সৌভ্রাত্র এবং সমাজেও সৌভ্রাত্র জাগিয়া উঠিবে। বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের অবস্থা যথেচ্ছাচারিতার অবস্থা, ইহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে আদৌ মঙ্গলজনক নহে।

সাহিত্য বিচ্ছিন্ন ভাবে গঠিত হইতেছে বলিয়া ধর্ম্মেরও মর্য্যাদা নষ্ট হইতেছে, তৎসহ জাতীয় ব্যবহার প্রতিও লোকের অশ্রদ্ধা হইতেছে। এই চাষার দেশে চাষ আমাদের প্রতিভ লোকের মতিগতি একপ্রকার নাই—তাহার উপর ভারতের মত কৃষি-প্রধান দেশে অবাধ গো, মেষ, মহিষ,ও পক্ষী হননে কি অভাবনীয় অনিষ্ট-পাত সংঘটিত হইতেছে, তজ্জনিত কৃষির কি হানি হইতেছে—তাহা কে না বলিতে পারে; ফলে এই অনিষ্টের ভারে কৃষককুলই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছেন। কাজেই এইজন্য মধ্যচিত্ত সম্প্রদায়ের জীবিকা সমস্যা দিন দিন কঠোরতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ বিষয়ে আমি কয়েকটি বিশেষ অত্যাবশ্যকীয় কথা এই প্রবন্ধে ২৪ পরগণা বার্ত্তা বহ পত্রিকা হইতে আলোচনার পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য বলিতে ইচ্ছা করি।

পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্লাবনে কতকগুলা বাবু হিন্দু ডুবিলেও, সমগ্র হিন্দুস্থান এখনও ডুবে নাই। যে দিন সমগ্র হিন্দুস্থান পাশ্চাত্য-জাতির বিলাস-সভ্যতায় ডুবিবে, সে দিন হিন্দুর অস্তিত্ব আর থাকিবে না। এই পাশ্চাত্য-প্লাবনে হিন্দুর সমাজ বৃক্ষ টলিয়াছে বটে কিন্তু এখনও হিন্দুর মেরুদণ্ড বা মূল দেশ (vestigial structure) টলে নাই। তবে এ বিষ যখন একবার ঢুকিবার সুবিধা পাইয়াছে তখন যে ইহার সংক্রামক প্রভাব সমাজের সর্ব্বাঙ্গে শনৈঃ শনৈঃ ছড়াইয়া পড়িবে, তাহা আশা করা যায়। এই বিষ যে সুদূর ভবিষ্যতে হিন্দুর জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিবে—তাহাতে আর কোন ভুল নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের শরীরে বিষের ন্যায় কার্য্য করে,কিন্তু বিষ হইতেও ত বিকারী রোগীর জীবনের প্রত্যাশা করা যায়। এই যে পাশ্চত্য শিক্ষা-সংস্পর্শ—ইহা

আমাদের অহিতকারী হইয়া আসিলেও ইহার নিকট কালে আমরা অনেক কঠিন শিক্ষা (Stronger lessons) লাভ করিবার আশা করিতেছি, বোধ হয় যেন সেই আশারই ক্ষীণালোক ক্রমশঃ দেখা দিতেছে। বার বার অনেক বিফলতার মধ্য দিয়া ইহা আমাদের জীবনের দুর্ব্বলতা গুলিকে ধরাইয়া দিবে। যে মদ মানবকে সর্ব্বস্বান্ত করে, সেই মদেই আবার মানবের চৈতন্য হয়। অনেক মাতালেরও ত জীবনের পরিবর্ত্তন দেখা গিযাছে। এই পাশ্চাত্য সভ্যতার মদিরা আমাদিগকে ক্রমশঃই মাতাল করিয়া তুলিতেছে—এই সভ্যতার মদ্য ব্যতিরেকে আমাদের জীবন-যাত্রা এখনই সুদুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এত অভাবেও, এত লাঞ্ছনা সত্বেও, পারিবারিক এত অশান্তিতেও আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার শৌণ্ডিকালয়ে যন্ত্রচালিত ক্রীড়নকের ন্যায় চলিয়াছি: কিন্তু আর বেশী দিন নয়, পৃথিবীর চৈতন্যের দিবস আগত প্রায়। মাতালের আত্ম-শোচনার কাল আসিতে আর বিলম্ব নাই। পাশ্চাত্য-সভ্যতার আত্যন্তিক বৃদ্ধি ও চরম সীমা আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদিগের প্রাচ্য-জীবনেও আত্যন্তিক অভাব ও নির্বেদ উপস্থিত। শীঘ্রই একটা প্রতিক্রিয়া যে পৃথিবীর বর্ত্তমান সভ্যতার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইবে তাহার সূচনা আমরা ইতিমধ্যেই দেখিতে পাইতেছি। এখন বাস্তবিকই সমগ্র জগতের একটা প্রতিষ্ঠা-হীন অবস্থা—যথেচ্ছাচারিতার কাল,অহঙ্কার ও অজ্ঞতার যুগ। প্রকৃত সভ্যতা ও শিক্ষা, প্রকৃত বিজ্ঞান মানব জীবনকে এখনও সার্থক করে নাই—সত্যের প্রকৃষ্ট পথ ছাড়িয়া স্বপ্ন-রাজ্যে এখনও মানব বিচরণশীল। উচ্চ আদর্শ-শিখরে এখনও আমরা উপনীত হই নাই। আত্ম-সুখকেই আমরা শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া ধরিয়াছি, প্রকৃত সুখের সন্ধান এখনও পাই নাই। আমরা ব্যক্তিগত জীবনকেই ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র, সমষ্টিই যে প্রকৃত জীবন, সমষ্টিই যে ব্যষ্টির শিক্ষাদাতা, সুবিধা দাতা,প্রকাশ-কর্ত্তা, তাহা আমরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছি কই? কেবল আমিত্ব ও আপনার লইয়াই ব্যস্ত, কেবল সংকীর্ণতার মধ্যেই আমরা আবদ্ধ। আমাদের চিন্তা এবং কার্য্যকে আমরা জগতের মধ্যে বিলাইয়া দিতে এখন অক্ষম? পাশ্চাত্য-সভ্যতার নিকট হইতে আমরা একদেশদর্শিতা ও আত্ম-সুখপরায়ণতাই লাভ করিয়াছি, আমিত্বকেই বড় করিয়া তুলিতেছি। কিন্তু কোন কালেই অহঙ্কার জগতে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই। দীনতা এবং বিনয়ের গৌরব জগৎ চিরদিনই মাথায় করিয়া রাখিয়াছে। কত রাজপুত্রের অহঙ্কার ধূলার সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে। কিন্তু বুদ্ধদেব রাজপুত্র হইয়া যে দীনতার মুকুট পরিয়াছিলেন, তাঁহার গৌরব আজও পৃথিবী বহন করিতেছেন।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

জন্মাষ্টমী।

(১)

নীরব নিস্তব্ধ সব নিশীথ নিথর,
নীল নীরদ ঘন আবরিয়া গগন;

ঝর ঝর ঝরে বৃষ্টি পড়ে নিরন্তর,
অসিত অষ্টমী তিথি আঁধার ভুবন।
আঁধার সে কারাগারে! কংশ দুরমতি,
বসুদেব দেবকীবে করি শৃঙ্খলিত
রাখিয়াছে, সাবধানে প্রহরী বেষ্টিত ;
চিন্তায় পীড়িত সদা সে দোঁহার চিত।
সহসা দিব্যালো-জ্যোতি হ'ল বিকিরণ,
যতেক প্রহরী সব ঘুমে অচেতন ;
বসুদেব, দেবকীর খুলিল বন্ধন,
হেরি জ্যোতির্ম্ময় পুত্র জগত মোহন।
পিতা মাতা উভে পুত্র করি দরশন,
কাঁদিয়া উঠিল, ভাবি কংশের শাসন।

(২)

চমকিল চপলা আলোকিল অবনী,
আকাশ সম্ভব এক হ'ল দৈব-বাণী ;—
"রাখি মোরে নন্দালয়ে নন্দের নন্দিনী
নব, লয়ে আসি' পাল' জনক জননী।
নারিবে বধিতে কেহ, স্বয়ং সে ঈশানী
(মহামায়া মায়াবিনী মহাশক্তিশ্বরী)।
বসুদেব পুত্র ক্রোড়ে চলিল তখনি,
সঙ্গে চলে কাল ফণী ফণা সুবিস্তারি।
চমকি চপলা করে পথ প্রদর্শন,
সহসা মায়ার নদী সম্মুখে সৃজন,
শিবারূপী ধর্ম্ম, পার হইল দেখিয়া ;
পুত্র কোলে তবে বসু সাহস করিয়া,
নামি জলে হারাইল অমূল্য রতন,
খুঁজিতে খুঁজিতে পুনঃ লভিল সে ধন।
নন্দালয়ে রাখি পুত্র যশোদা সদন,
বসুদেব আনিল তার কন্যা মহাধন।
প্রভাতে জানিয়া বার্ত্তা কংশ নরবর,
বৃথায় বধিতে গেল পর্ব্বত উপর॥

শ্রীমিহিরজ্যোতি দাস।

— —

চরিত্র।

কর্ম্ম সাধনা তোমা হতে ওগো,
তুমিই ত্যাগের মন্ত্র ;
তোমা হ'তে সব লভেছে জনম
আগম, পুরাণ, তন্ত্র।
শরৎ প্রভাতে শেফালি তুমি,
হৃদয় আকাশে চন্দ্র ;
কাম্য জগতে বাসনীর কাছে
সদা তুমি মেঘ মন্দ্র।
পরাধীন তুমি নহ ত কভু,
ষড়-রিপু তব ভৃত্য ;
বন্দী-সম দ্বারে বসে আছে,
চায়নাক তারা বিত্ত।
আঁধার ঘরের রতন দীপ,
নিজ হাতে তব জ্বালা ;
ভক্তি বিনয় যূথি, যাতি গাঁথা
সেইত তোমার মালা।
ছোট, বাঁশরী করেতে তোমার,
সাহানা রাগিনী ভরা ;
বিশ্ব প্লাবিয়া উঠিছে গীতি
হৃদয় আনন্দ করা।
সবা হ'তে তব আসন উচ্চে,
ধারনাক কারো ধার ;
মর জগতের মাধুরী তুমি
চির গরিমার হার।

শ্রীসুধারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

ভাদরে।

(১)

সারাদিন ঝরিতেছে জল
কভু পীন কভু ক্ষীণধার,—
যেন এই মেদিনী মণ্ডল
অতিকায় নির্ঝর আকার।

(২)

মনে হয়—মম রুদ্ধ শোক
গুপ্ত ছিল গগন-গহ্বরে,
আজি যেন দ্যুলোক ভূলোক
বিপ্লাবিয়া অবিশ্রান্ত ঝরে।

(৩)

কাঁদিব না—কান্না কিছু নয়,
নারী-মায়া ফেলিব মুছিয়া,
ভেবেছিনু!—কেন এ হৃদয়
তবে আজি উঠে গুমরিয়া?

(৪)

তুচ্ছ মায়া—নিজস্ব ধারণ,
ভোগ-সুখে বিরচে বন্ধন;
উচ্চ প্রেম—ঘুচায়ে কামনা
মুক্তি-রূপে করে আলিঙ্গন।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

অসময়ে।

দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও রামকমল বাবু পাঁচজন প্রতিবাশী বন্ধুর অনুরোধে যখন মনোরমাকে আপনার বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গিনী করিবার জন্য কন্যা অপরাজিতাকে লুকাইয়া মাত্র পুরোহিত সঙ্গে বিবাহ করিতে গমন করিলেন, অপরাজিতা তখন বুঝিল যে, এইবার পিতা আমার পর হইয়া যাইবেন। সে তখন কচি খুকীটি নহে। সে তখন ভাল, মন্দ, সুখ, দুঃখ সমস্তই বুঝিতে শিখিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া পিতা যে তাহার অসীম পিতৃ স্নেহের মধ্যে একটা বিরাট অপূর্ণতা আনিয়া ফেলিবেন, ইহা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। আপনা আপনি প্রাণের ভিতর সে এই রকম একটা অভাব অনুভব করিতে লাগিল। সংসারে সবেমাত্র সেই কন্যাটীকে বুকে করিয়া রামকমল বাবু আজ পাঁচ বৎসর হইল তাঁহার মৃত-পত্নীর শোক ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু কোথা হইতে যে কি হইল, কেন তিনি হঠাৎ বিবাহে সম্মতি দান করিলেন, অপরাজিতা তাহার কিছুই মীমাংসা করিতে পারিল না। সে প্রাণ-ভরিয়া পিতাকে ভালবাসিত, নিজের সমস্ত আদর যত্ন দিয়া পিতার খালি বুক পূর্ণ করিয়া রাখিত। এতদিন পরে যে এমন একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন তাহার পিতৃ স্নেহভরা প্রাণটীকে ব্যথিত করিয়া তুলিবে, তাহা সে কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। জগতে এমন অনেক অভাব আসিয়া পড়ে,যাহার প্রতীকার হয় না বা করিতে পারা যায় না। অপরাজিতা নীরবে এই অভাব, এই ব্যথা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইল। পিতার যাহাতে মনস্তুষ্টি হয়, সন্তানের তাহাই করা কর্ত্তব্য। সে তাহার ক্ষুদ্র মনটীকে সংযত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। নিজের গুপ্ত-বেদনা বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া, পিতা যাহাতে সুখী হন,

সেই চেষ্টায় আপনার সমস্ত হৃদয়টুকু প্রয়োগ করিল।

মনোরমাকে গৃহে আনিয়া রামকমলবাবু আবার নূতন সংসার পাতিলেন।

প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, অপরাজিতার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ-প্রায়, কিন্তু রামকমলবাবুর সেদিকে আদৌ লক্ষ্য নাই। যুবতী স্ত্রীকে গৃহে আনিয়া রামকমলবাবু তাহারই সন্তোষ-সাধনের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। কেহ যদি কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করিত, তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, বলিতেন—"আমার মেযের এমন কি বেশী বয়স হয়েছে যে, এরই মধ্যে তার বিবাহ না দিলে নয়। আরও দু-এক বৎসর যাক, তারপর দেখা যাবে।" পাড়া-প্রতিবাসীরা ক্রমেই হার মানিল। রামকমলবাবুও বিরক্ত হইয়া ক্রমে লোকজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিলেন।

স্বামী-গৃহে আসিয়া মনোরমা লক্ষ্য করিল যে, বৃদ্ধের সকলের অপেক্ষা বেশী টান এই কন্যাটীর উপর। সে কিসে অপরাজিতার উপর তাহার স্বামীর বিরক্তি আনিয়া দিবে—তাহারই অবসর খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশ্য এ বিষয়ে পরামর্শদাতার অভাব ছিল না। বৃদ্ধ স্বামী, কখন আছে, কখন নাই, শেষে কি সে পথে বসিবে। এই সময় থেকে যাহা কিছু করিয়া লইতে পারা যায়। নিজের যাহাতে একটা ভালরকম "হিল্লে" হয়, স্বামীর অবর্ত্তমানে যাহাতে কোনও কষ্ট না হয়, এই প্রকারের নানারকম পরামর্শ পাইয়া ক্রমেই মনোরমা এতটা স্বার্থপর হইয়া উঠিল যে, কিসে স্বামীর সমস্তটুকু নিজের আযত্তে লইয়া আসিবে, প্রাণপণে তাহারই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ স্বামীর উপর সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর অধিকার স্থাপন করিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না। মনোরমা স্বল্প আযাসেই তাহার সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া লইল।

"দেখ, আজ তোমায় একটা কথা বল্‌বো। মনে করেছিলাম বল্‌বো না, কিন্তু না বল্‌লেও নয়। তোমার মান-সম্ভ্রম যাতে বজায় থাকে, সে চেষ্টা আমি ছাড়া আর কে কর্‌বে বল? হয়ত তুমি মনে কর্‌তে পার যে, আমি তোমায় লাগিযে ভাঙিয়ে তোমার মন খারাপ করে দিচ্ছি, তা মনে কর্‌লেও এতটা অন্যায় সহ্য করে কতদিন থাক্‌বো বল? আর তুমি ছাড়া আমার আপনার বল্‌তে ত্রিসংসারে কে এমন আছে, যার কাছে আমার প্রাণের বোঝা নামিযে কতকটা ঠাণ্ডা হব।"

রামকমলবাবু নির্নিমেষ-লোচনে মনোরমার কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিতেছিলেন, আফিমের মৌতাতে চোখ দুটী ক্রমেই বুজিয়া আসিতেছিল। রামকমলবাবু ভাবিতেছিলেন, মনোরমা কি সুন্দরী? কি সুন্দর সুঠাম গঠন, আধ-বিকশিত যূথিকার মত ফুটফুটে ঢলঢলে রূপ, বড় বড় চোখের ভাসা ভাসা চাহনি, উষার আকাশে তরুণ-অরুণের প্রথম রেখাপাতের মত আরক্তিম কপোল, লালটুক্‌টুকে ঠোঁট দুখানি। বুঝি অত রূপ আর ত্রিভুবন খুঁজিলেও পাওয়া যায় না। তিনি আত্মহারা হইয়া মনোরমার সেই অনুপম রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন।

এমন সৌভাগ্যবান যে তিনি ব্যতীত আর কখনও কেহ হইয়াছে বা হইতে পারে—তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইতেছিল না।

তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মনোরমা পুনরায় বলিল—"বলি ওগো শুন্‌ছ? কথাগুলো ভাল লাগ্‌ছে না বুঝি? তা লাগ্‌বে কেন? আমি তোমার কে যে আমার কথা ভাল লাগ্‌বে? আমার আর কি বলনা? ভাল না বাস, তবুও তোমা ছাড়া আমার গতি নাই, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার সেবা করেই মর্‌তে পারি, আমার আর অন্য সাধ নাই। তবে, তুমি আমার স্বামী, দেবতা, তোমার অকল্যাণ হয়, তোমার মুখে চুণ-কালী পড়ে, এমন কাজ প্রাণ থাকৃতে আমার দ্বারা হবে না; তাই বলা। না হলে আমি কে? দাসী বইত নয়। আমায় পায়ে ঠেল্‌তে ত আর—"

মনোরমা এইবার সত্যই কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সেই আকস্মিক ক্রন্দনের স্বরে বৃদ্ধ রামকমলবাবু যেন হঠাৎ স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিলেন। তাঁহার সুখকল্পনার রাজত্বটা কে যেন বিজয়-দুন্দুভি বাজাইয়া জয় করিয়া লইল। বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিয়া রামকমলবাবু দেখিলেন—মনোরমা তাঁহারই বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। ব্যস্ত হইয়া তিনি মনোরমার মুখখানি মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, তা কি বল্‌ছিলে? তুমি কাঁদছ কেন মনু? আমি এতক্ষণ তোমার মুখপানে চেয়ে কেমন অবাক হয়ে গিছ্‌লাম। কিছু মনে ক'রো না। কি হয়েছে? কে কি বলেছে তোমাকে?"

"না, আমায় আবার কে কি বল্‌বে? আমি ত তুমি ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কই না, কেবল না কহিলে নয়—তাই মেয়েটার সঙ্গে দরকার মত দু-একটা কথা কইতে হয়। সে যে এমন করে আমায় অপমান করবে, তা আমি একবারও ভাবিনি।"

"ওঃ! বুঝেছি। হতভাগা মেয়েটার আজ কাল বড় স্পর্দ্ধা হয়েছে। তোমাকে অপমান করলে? কেন কি হয়েছিল?"

"সে কথা শুনে আর কাজ নাই। সে কথা আমি কিছুতেই তোমার সাম্‌নে বলতে পারবো না। মাগো, এতটুকু মেয়ে, তার কথা শুনলে শিউরে উঠ্‌তে হয়। বলে কিনা—যাক্, আমায় মাপ কর, তোমার পায়ে পড়ি, সে কথা আমার মুখ দিয়ে কিছুতেই বাহির হবে না।"

"তোমায় বলতেই হবে। এর প্রতকার না কর্‌তে পারি ত আমি নিরঞ্জন মুখুজ্যের সন্তান নই।"

"আজ ৫।৬ দিন হইল অপরাজিতা তাহার বড় সাধের ঘরকরনা ছাড়িয়া মাতুলালয়ে আসিয়া বাস করিতেছে। এই গৃহের একদিন সেই-ই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিল। একদিন সে এই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে নিজের সমস্ত পসার-প্রতিপত্তি লইয়া বাস করিত। জননীর মৃত্যুর পর হইতেই আজ এতকাল কেবল পিতাকেই ভালবাসিয়া আসিতেছে। একদণ্ড না দেখিলে যে পিতা চোখের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিতেন না, সে সামান্য একটু অসুস্থ হইলে তিনি তাহার প্রতকারের জন্য ছটফট করিয়া

বেড়াইতেন, আজ তাহার সেই পিতার এ পরিবর্ত্তন কে করিল!

এই কয়দিন হইল অপরাজিতা মাতুলালয়ে আসিয়া সমস্ত দিনরাত কেবল কাঁদিয়াছে। তাহার বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন তাহার মাতার কাল হয়। মাকে সে ভাল করিয়া চিনিতেও পারে নাই। আজ এতদিন পরে তাহার হৃদয়ের প্রতি পরতে পরতে সে মাতৃ-স্নেহের অভাব অনুভব করিতে লাগিল। সে ভাবিত কেন এমন হইল? পিতার এত স্নেহ সে কেমন করিয়া হারাইয়া ফেলিল! ঘরের এককোণে একবেলা খাইয়া পড়িয়া থাকিবার অধিকারও কি তাহার নাই। বিমাতার সহিত সে জ্ঞানতঃ ত কোনও অসদ্ব্যবহার করে নাই। কখনও ত তাহার মুখের উপর জোর করিয়া কোনও কথা বলে নাই। তবে কেন সে তাহাকে এই শাস্তি দিল।

মাতুলালয়ে আসিয়া অপরাজিতা দুদণ্ডের তরেও সুস্থির হইতে পারে নাই। পিতাকে দেখিবার জন্য সে দিনরাত ছুটফট্ করিত, কিন্তু রামকমলবাবুর তখন সে দুঃখ-কষ্ট দেখিবার তিলমাত্রও অবসর ছিল না। তিনি তখন যুবতী স্ত্রীর নেশায় বিভোর হইয়া মনোরমার রাঙা চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া-ছিলেন। তখন মনোরমা ব্যতীত তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না। হায় নারী! অমনি করিয়াই তুমি সংসারের সর্ব্বনাশ সাধন কর। অমনি করিয়াই তোমার মানব নিজের সমস্ত হারাইয়া রমণীর রূপের বহ্নিকে জীবনের সাধনা করিয়া লয়।

অপরাজিতার আর দিন কাটে না। সে আসিয়া অবধি পিতার কোনও খবর পায় নাই। কাহাকেও পিতার বিষয়ে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহস হইত না। কারণ সে জানিত যে তাহার পিতার উপর কেহই সন্তুষ্ট নয়, কেহই তাহার কোনও কথায় থাকিতে অনিচ্ছুক।

অপরাজিতাকে বিদায় দিয়া, মনোরমা তাহার পিত্রালয় হইতে তাহার মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীকে লইয়া আসিল। সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম্মই সেই মাতৃহীনা দুঃখিনী বালিকার দ্বারা সম্পাদিত হইত। তাহার যাওয়ার পর সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিবার জন্য লোকের অভাব হইল। ঝি চাকরেরা পরলোক বইত নয়। তাহাদের উপর সংসার নির্ভর করা যাইতে পারে না। আর ঝি চাকরের দরকারই বা কি? দু'একজন আপনার লোক থাকিতে ঝি চাকর রাখিয়া বাজে খরচ করাইবার অপ্রয়োজনীয়তাটা রামকমলবাবুকে বুঝাইয়া দিতে মনোরমাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না।

বৃদ্ধের আজ দুই তিন মাস হইল সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে। বাঁচিবার আশা কিছুই নাই। এই কয়দিনের মধ্যে মনোরমা গৃহের অধিকাংশ মূল্যবান দ্রব্যগুলি তাহার মাতার দ্বারা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছে। বাটীতে সকলেই আছে, হাসি-খেলা, আমোদ-প্রমোদ, সমানভাবেই চলিতেছে। কিন্তু বৃদ্ধের এই দারুণ দুঃসময়ে তাঁহার সেবা করিবার জন্য একটী প্রাণীও নাই। মনোরমার এতটা স্বামী-

ভক্তি হঠাৎ কেমন করিয়া কর্পূরের মত উপিয়া গেল, বৃদ্ধ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বৃদ্ধ কাতর-কণ্ঠে মনোরমাকে কাছে আসিবার জন্য চীৎকার করিয়া ডাকিত, কিন্তু মনোরমা সে কথায় কর্ণপাতও করিত না। সমস্ত দিনরাত যে ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, যাহাকে স্বর্গের দেবী বলে বৃদ্ধের ধারণা ছিল, সে অকস্মাৎ এমন রাক্ষসীর আকার ধারণ করিবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এতদিনের পর তাঁহার কন্যা অপরাজিতাকে মনে পড়িল, কন্যার অনাদর-ক্লিষ্ট ম্লান মুখখানি স্মরণ করিয়া বৃদ্ধ অনুতাপের অসহ্য জ্বালায় মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইত। "কোথা মা আমার! একবার এসে দেখে যা, তোরই অভাবে তোর বৃদ্ধ পিতার আজ কি শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে।" এই বলিয়া প্রায়ই চীৎকার করিতেন। রোজই ভাবিতেন—"হয়ত মা আমার, এইবার আমার কাছে নিশ্চয়ই ছুটে আস্‌বে। একবার মায়ের দেখা মিল্‌লে হয়, মায়ের হাতে ধরে আমার কৃত কুকর্ম্মের জন্য তার মার্জ্জনা চেয়ে নেব। মা আমার এমন মেয়ে নয়, বৃদ্ধ পিতাকে অবশ্যই মার্জ্জনা করবে।"

কি উপায়ে পিতার সংবাদ পাওয়া যাবে—ইহা ভাবিয়া অপরাজিতা বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বিমলকুমার নামে একটী বালক তাহাদেরই গ্রামের স্কুলে পড়িতে যাইত, সে তাহাকে ধরিয়া বসিল, অনেক অনুনয়-বিনয় করিল, যাহাতে সে তাহার পিতার সংবাদ আনিয়া দেয়। অনেক বলা-কওয়ার পর আগত শনিবার দিন সে সংবাদ আনিয়া দিতে সম্মত হইল।

"বাবা আমার! এমন দশা তোমার কে কর্‌লে! আমায় আগে কেন খবর দাও নাই! তা' হ'লে ত আর এতটা ঘাড়তে পেত না! এখন কি হবে! কেমন করে তোমায় বাঁচাব বাবা।"

বৃদ্ধের শিয়রে বসিয়া অপরাজিতা হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল। রামকমলবাবুর তখন কথা কহিবার শক্তি ছিল না। তাঁহার শুষ্ক, কোটরাবিষ্ট চক্ষু দুইটী কন্যার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া একটা অব্যক্ত কষ্টে তিনি দুই হাত দিয়া নিজের অস্থিসার বুকখানা চাপিয়া ধরিলেন। প্রাণের সমস্ত ভাষা তাঁহার কণ্ঠে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে কন্যার স্নেহের কোলে মাথা রাখিয়া বৃদ্ধ চিরদিনের মত চক্ষু বুজিলেন।

তখন অপর গৃহে বসিয়া মনোরমা ও তাহার মাতা লোহার সিন্দুক খুলিয়া বৃদ্ধের কষ্টসঞ্চিত অর্থ ও অলঙ্কারের হিসাব করিতেছিল।

শ্রীকুমুদ গোপাল ভট্টাচার্য্য।

হিন্দু-রাজগণের আদর্শ।

অশোক (ধর্ম্মাশোক)।

রাজনীতি ধর্ম্মনীতিতে পরিণত—দয়া।

মহাত্মা অশোকের নাম শুনিলেই যেন দয়া-ধর্ম্মের ভাবে হৃদয় আপূরিত হয়। তাঁহার রাজত্ব পৃথিবীতে শান্তিসুখের প্রস্রবণ স্বরূপ হইয়াছিল। ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের একমাত্র

লক্ষ্য ছিল—তাঁহার রাজত্বেরও ধর্ম্মই একমাত্র ব্রত হইল। তিনি রাজনীতিকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মনীতিতে পরিণত করিয়া রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলেন। তিনি আপন শাসন-নীতি প্রচারের সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় অপরের দুরধিগম্য গ্রন্থ বা লেখ্য পত্র মধ্যে নিবদ্ধ না করিয়া তিনি রাজকীয় ব্যবস্থাসকল সরল লৌকিক ভাষায় প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বসাধারণের গোচর করিলেন। এই সমস্ত অনুশাসন এইরূপই ধর্ম্মমূলক যে ইহাদিগকে ধর্ম্মানুশাসন বলাই সঙ্গত হয়। তিনি কেবল ধর্ম্মাজ্ঞা প্রচার করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই কিন্তু যাহাতে তদীয় অনুশাসন প্রতিপালিত হয় এবং লোকের নীতি বিশুদ্ধ ও উন্নত হয়, তদর্থে পরিদর্শনকারী কর্ম্মচারী সকলও নিয়োগ করিলেন। * সর্ব্ব প্রকার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা বা বিদ্বেষই তাঁহার উদার চরিত্রে স্থান পাইবার কথা নয়। তিনি সর্ব্বত্রই সমদৃষ্টি ছিলেন। তজ্জন্যই তিনি "দেবানাং প্রিয়ঃ" "দেবতাদিগের প্রিয়পাত্র" এই বিশেষ আখ্যা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দয়াশীলতার কথা ভাবিলে একেবারে অভিভূত হইতে হয়। তিনি কেবল মনুষ্যদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা নহে--কিন্তু প্রাণি-সাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর জন্য হাঁসপাতাল অর্থাৎ রোগি-নিবাস স্থাপন করেন; তদীয় অনুশাসন হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ—"Everywhere King Priyadashi, beloved of the Gods (Devanam priya), has founded two kinds of hospitals, both hospitals for men and hospitals for animals."

Prof. Buhler's translation.

তাঁহার এই সর্ব্বজনীন প্রীতির ভাব হইতেই তিনি "প্রিয়দর্শী" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি একমাত্র সামনীতি আশ্রয় করিয়াই রাজকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। ইহাতে যুদ্ধ বিগ্রহের নাম গন্ধও ছিল না; * অথচ তৎশাসিত ভারতবর্ষ ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষ অপেক্ষা আয়তনে কম ছিল না † তিনিই প্রথম

* cf "Edict V... .. . .

Now in all the long ages past, officers known as Census of the Law of Piety had never been appointed, whereas in the fourteenth year of my reign Census of the Law of Piety were appointed by me.

They are engaged among people of all sects in promoting the establishment of piety and the welfare and happiness of the lieges, as well as of the Yumas, Kambojas, Gandharas Rashikas Piteni Kas and other nations. [on my towers." Asoka (Ruler of 'Indian series) by Vincent A. Smith pp. 119—20.

* cf. Edict IV ....

"But now, by reason of the practice of piety by His Majesty King Priyadarshan, instead of the sound of the war-drum, the sound of the drum of piety is heard, while heavenly spectacles of processional cars, elephants, illuminations and the like are displayed to the people." Asoka—Ruler of India—p. 117.

† An empire exceeding British India in area, and extending from Sea to Sea. Ibid—p 86.

কেবল ধর্ম্মনীতিতে রাজ্যশাসন যে সম্ভবপর তাহা প্রদর্শন করিলেন এবং ধর্ম্মের শাসনে বলের শাসন অপেক্ষা যে অধিক শক্তি তাহাও প্রমাণিত করিলেন। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে অন্য কোন জাতির মধ্যে এই প্রকার কেবল ধর্ম্মের উপর কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। অশোকের ধর্ম্মরাজ্যের কথা আলোচনা করিলে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না।

অশোকের ধর্ম্মরাজ্যের নিদর্শন সকল এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া পৃথিবীর নিকট তাঁহার অসীম মহিমার পরিচয় দিতেছে। অশোক যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন ও শাসন সুশৃঙ্খলা প্রবর্ত্তন করেন, বর্ত্তমান সুসভ্য যুগও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বেশী কিছু প্রদর্শন করিতে পারে না বরঞ্চ ইহার পক্ষে সে সমস্ত হইতে অনুকরণ করিবারই যথেষ্ট বিষয় আছে। ধর্ম্মই অশোকের সর্ব্বকার্য্যের একমাত্র নিয়ামক হওয়ায় তিনি "ধর্ম্মাশোক" নামে চিরযশস্বী হইয়াছেন। *

* "The emperor, though destitute of the powerful aids of modern civilization was able to enforce his will at Kabul, distant twelve hundred, and at Giwi, distant a thousand miles from his capital. He was strong enough to sheathe his sund in the ninth year of his reign, to treat unruly border tribes with forbearance, to cover his dominions with splendid buildings, and devote his energies to the diffusion of morality and piety."

Asoka—(Ruler of India) by Vincent A. Smith, p. 86.

বিক্রমাদিত্য (মহারাজ)
বিদ্যোৎসাহিতা।

বিক্রমাদিত্য কেবল বিক্রমেরই আদিত্য নহেন—তিনি বিদ্যারও আদিত্য। তিনি শকদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ভারতবর্ষে একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শান্তির ছায়ায় হিন্দুর জাতীয় জীবনে নব স্ফূর্ত্তির প্রকাশ হইল। তাঁহার সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকে সাহিত্য-চর্চ্চার অসংখ্য স্রোত প্রবাহিত হইল।

তাহারই ফলে সংস্কৃত-সাহিত্যে কাব্য-নাটকের এক নবযুগ এই সময়ে আরম্ভ হইল। এই নবযুগ সংস্কৃত-সাহিত্যকে যে সমস্ত অমূল্য রত্ন-রাজি উপহার প্রদান করিয়াছে, সংস্কৃত-সাহিত্য তাহাদের প্রভায় চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকিবে। বিক্রমাদিত্য স্বীয় রাজধানীতে 'নবরত্ন' স্থাপন করিয়া ইহাকে ভারতবর্ষের বিদ্যাকেন্দ্ররূপে পরিণত করিলেন। এই 'নবরত্ন সভাই' সংস্কৃত-সাহিত্যের সৌর-মণ্ডলরূপে বিরাজ করিতে লাগিল।

এই নবরত্ন-সভা বিক্রমাদিত্যের অপূর্ব্ব অক্ষয়-কীর্ত্তি। মহাকবি কালিদাস এই নবরত্নের 'মধ্যমণি' ছিলেন। কালিদাস কেবল ভারতেরই কবি নহেন—তিনি জগতের কবি। সংস্কৃত-ভাষার ন্যায় মধুর ভাষা আর নাই—কালিদাসের রচনার ন্যায় মধুর রচনা আর সংস্কৃত-সাহিত্যে হয় নাই। পৃথিবীর কোন দেশের সাহিত্যে কালিদাসের উপমার তুলনা নাই। পৃথিবীর সাহিত্য কালিদাসের রচনা হইতে অন্ত-

সম্পদ্ লাভ করিয়াছে। কালিদাস যে 'সরস্বতীর বর-পুত্র' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন—এই সমস্ত বিবেচনা করিলে তাহা অতি-রঞ্জিত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তদীয় অমৃতময়ী লেখনী যেমন পৃথিবীতে তাঁহাকে অমর করিয়াছে, তদ্রূপ তাঁহার উৎসাহদাতা ও আশ্রয়দাতা মহারাজ বিক্রমাদিত্যকেও অমর করিয়াছে। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িণী তদীয় অমর কীর্ত্তি 'নবরত্ন সভার' অধিষ্ঠান হেতু চিরকাল সাহিত্য-সেবকদিগের মহাতীর্থরূপে পরিদৃষ্ট হইবে।

হর্ষবর্দ্ধন—দানশীলতা—আত্মত্যাগ।

বিক্রমাদিত্যের পর হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বিক্রমাদিত্যেরই ন্যায় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট তদীয় রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্যোৎ-সাহিত্য অপেক্ষা দান-শীলতার জন্যই অধিক স্মরণীয়। যে উপলক্ষে তাঁহার দানশীলতার প্রকৃষ্ট অবসর উপস্থিত হইত—তাহার নাম 'সন্তোষ-ক্ষেত্রের উৎসব।' প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইত। ধার্ম্মিক, নিঃস্ব, নিরাশ্রয় লোকেরাই ইহাতে নিমন্ত্রিত হইত। জাতি-ধর্ম্মের কোন বিশেষ না করিয়া সকলকেই মুক্তহস্তে দান প্রদত্ত হইত। রাজা হর্ষ ইহাতে প্রকৃত কল্পতরু সাজিয়াই বসিতেন। উৎসবান্তে তিনি আপনার সমস্ত রাজোচিত রত্নাভরণ ও পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিয়া দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করতঃ সামান্য বস্ত্র পরিহিত হইয়া দীন বেশ ধারণ করিতেন। এই প্রকারে সর্ব্বস্বদান করিয়া তিনি যখন দানশীলতার একশেষ প্রদর্শন করিতেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মত্যাগেরও একশেষ প্রদর্শিত হইত। রাজোচিত অশেষ-বিধ ভোগসুখের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও তিনি বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন, ইহা দেখিয়া কাহার মনে তাঁহাকে অলোকসামান্য মহাপুরুষ বলিয়া বোধ না হইবে? নর-দেহে দেবতা বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মিবে? তাঁহার ন্যায় প্রকৃত কর্ম্মযোগীর দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অতি বিরল। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র যেমন দেবতাদিগকে কলাদান করিয়া ক্ষীয়মান হইলেও পুনর্ব্বার শুক্লপক্ষে বর্দ্ধমান হয়, রাজা হর্ষও তদ্রূপ সমস্ত রাজৈশ্চর্য্য নিঃশেষিত করতঃ দীনভাবাপন্ন হইলেও তদীয় রাজশ্রী উত্তরোত্তর উজ্জ্বল ভাবই প্রাপ্ত হইত। তাঁহাকে শিলাদিত্য না বলিয়া শীলাদিত্য অর্থাৎ চরিত্রের ভাস্কর বলিলেই অধিক শোভন হয়।

উপরে যে আদর্শের রেখাপাত করা হইল, তাহাতে লোকান্তরপ্রাপ্ত রাজগুণ সকল কিরূপ বিকাশ ব্যপ্ত হইয়াছে, তাহার আভাস আমরা দিয়াছি। এই সমস্ত গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই হিন্দুগণ রাজাকে "পরম দেবতার" আসন দিয়া থাকেন, যথা—"মহতী দেবতাহেষ্য নররূপেণ তিষ্ঠতি।"

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নিবেদন।

গিয়াছে চলি কতই দিন
চাহিয়া আছি পথেরি পানে।
রয়েছি জেগে কতই নিশি
আছি তোমার মুরতি ধ্যানে॥

ডুবিয়া গেল কতই রবি
হৃদয় মোর আঁধার করি।
হাসিল পুনঃ কতই চাঁদ
দেখাতে তব করুণা হরি॥
কোকিল-কণ্ঠে কতই গান
মাতিল তাহে কতই কবি।
আসিল সন্ধ্যা কতই পুনঃ
দেখাতে তব রূপের ছবি॥
বহিয়া গেল কতই বায়ু
ধ্বনিয়া তব করুণা দান।
ধীরে নাচিল কতই তরু
বিভোর যাহে জগত-প্রাণ॥
ডাকিনু আমি কতই বার
শুধু তোমার নামটি ধ'রে।
করিনু আমি কতই আশা
একটিবার পরশ তরে॥
রহিব আর কতই দিন
চাহিয়ে শুধু পথেরি পাশে।
জাগিব আর কতই রাতি
হেরিতে ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশে॥

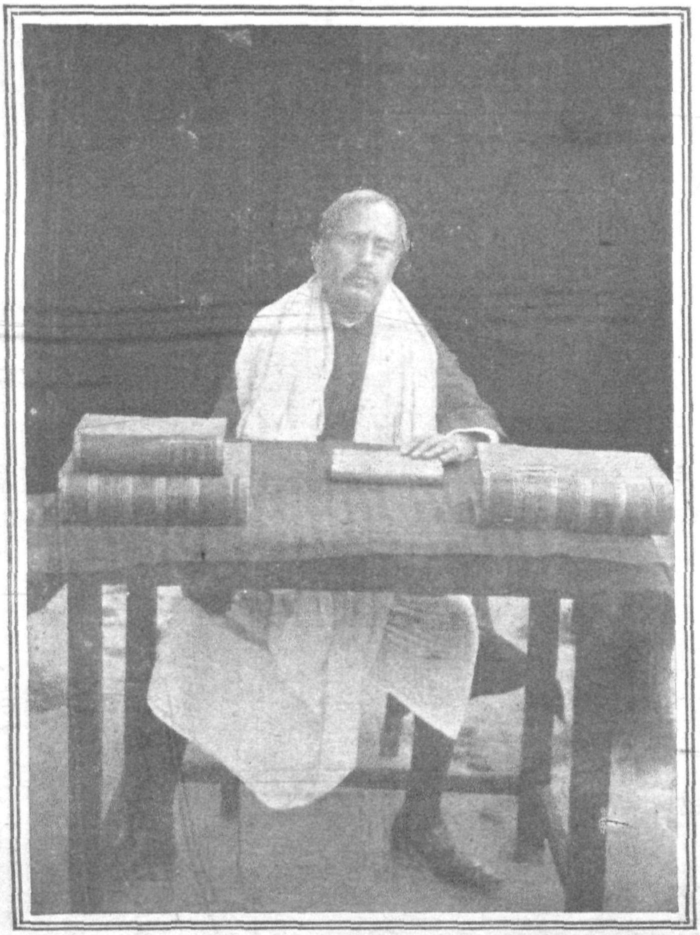
শ্রীমতী সুধনসুন্দরী দেবী।

সাধু-সম্মিলন।

যিনি যেরূপ সহবাসে ভ্রমণ করেন, যেরূপ লোকের সহিত বসবাস করেন—তাঁহার চরিত্র সেইরূপ ভাবেই গঠিত হয়, ইহাই সুধীজন-সম্মত--শাস্ত্র বাক্য। হাওড়ার সুবিখ্যাত কুষ্ঠ-চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ শর্ম্মা চির কালই ধর্ম্মভাব-সম্পন্ন, চিরকালই ধর্ম্মের জন্য সাধু সহবাসে কালাতিপাত করিতে অভ্যস্থ। বাল্যকালে নবদ্বীপ, কাশী প্রভৃতি স্থানে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া কিছুকাল শাস্ত্র ব্যবসায়ে ব্রতী হন। এই সময় হইতে রামপ্রাণের প্রাণে পীড়িত ব্যক্তিগণের কষ্টের কথা জাগিয়া উঠে --সেইসময় হইতেই তাঁহার মতি পরিবর্ত্তন—সঙ্গে সঙ্গে উপায় উদ্ভাবনের জন্য তিনি ভগবান সদাশিব প্রদত্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কবিরাজী শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি হাওড়ার খুরুট রোডে ঔষধালয় স্থাপন করিয়া ভগবানের কৃপায় সামান্য অবস্থা হইতে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। কুষ্ঠ-চিকিৎসায় বিশেষভাবে কৃতীত্ব দেখাইয়া তিনি দেশের কবিরাজদিগের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই কুষ্ঠচিকিৎসার অধিকাংশ ঔষধই তাহার সাধু সেবার ফল। বহু জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসীগণের সহবাসে শর্ম্মা মহাশয় নিজ চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন—ধর্ম্মে প্রগাঢ় মতিমান হইয়াছেন এবং সাধুগণের কৃপালাভ করিয়া অশেষ যন্ত্রণাপ্রদ কুষ্ঠের নিদানতত্ত্ব অবগত হইয়া পীড়িতের দুঃখ মোচন করিতেছেন। কুষ্ঠ-চিকিৎসায় তিনি এক প্রকার সিদ্ধহস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দুরারোগ্য ব্যাধি-পীড়িত ব্যক্তিগণকে আমরা এই কবিরাজের চিকিৎসাধীনে আসিতে অনুরোধ করি। যে সকল রোগ আরোগ্য হইবে না এবং সকল ব্যাধি চিকিৎসায় আরোগ্য হইবে। কবিরাজ রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জনের নিকট আসিলেই রোগীগণ তাহার সঠিক সংবাদ পাইবেন। তিনি রোগের অবস্থানুসারে পারিশ্রমিক ও ঔষধের মূল্য লইয়া থাকেন। বিগত বৎসরে তাঁহার সাধু-সঙ্গ লাভের একখানি চিত্র এই সংখ্যায় প্রদর্শিত হইল।

আরোগ্য সংবাদ।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম—হাওড়া পানপুর পোষ্টাফিসের অন্তর্গত রামচন্দ্র পুর গ্রামের কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রথমেশ চন্দ্র দাসের "মেহাশনি" প্রমেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ; অনেক দুরারোগ্য রোগী ইহাতে আরোগ্য হইয়াছেন। আমরা এই নবীন কবিরাজের ক্রমোন্নতি কামনা করি।



শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দোপাধ্যায় কবিভূষণ।

BENGAL LIBRARY
JUN. 2 - 1915
WRITERS BUILDINGS.

আলোচনা, ১৯শ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২২।

BENGAL LIBRARY
JUN. 2 - 1915
WRITERS BUILDINGS.

আগমনী।

(১)

বাজিল মঙ্গল-শঙ্খ নিস্কন জলদ-রবে।
মৃদুল মধুর বায়,
শুভ্র অভ্রে ভেসে যায়,
হাসে শশী নীল নভেঃ রূপের গরবে।
হাসে তারা দিক্‌বালা হাসিছে নীরবে॥

(২)

বসুধার অঙ্কে হাসে কুসুমের দল।
মালতী মল্লিকা জবা,
যাতী যুঁথী কত শোভা,
সেফালি মধুর হাসি লুটে ভূমিতল।
কাশকুসুমেরা শোভে হাসি জল-স্থল॥

(৩)

প্রাবৃটের শোক-অশ্রু বহিছে না এবে আর।
কমল-কহ্লার জলে,
স্থলপদ্ম হাসে স্থলে,
প্রকৃতি হাসিয়া দিলা শুভ সমাচার,—
'শারদা আসিছে ভবে নাহিক বিলম্ব তার।'

(৪)

আসিবেন বঙ্গ-গৃহে জগত-জননী।
অম্বিকা আসিবে ব'লে,
সাজে ধরা ফুলে-ফলে,
তরুণ অরুণ নভেঃ হাসিছে কেমনি!
ধরাতলে আসিবেন জগত-জননী॥

(৫)

স্বর্ণ-রথের হেমশীর্ষ দূরে দেখা যায়।
সিংহ মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
নন্দী-ভৃঙ্গী অনুচর,
ভবানীরে ল'য়ে ভবে উল্কাসম ধায়।
মায়ের রথের চূড়া অই দেখা যায়॥

(৬)

কি লাগি আসিবে বঙ্গে অন্নদা এবার?
প্লাবনের অত্যাচার,
মহামারী অনিবার,
অজন্মা রাক্ষস করে শান্তি চুর্‌মার্।
অন্নহীন বঙ্গে শুধু ধ্বনি হাহাকার॥

(৭)

কোথাও নাহিক সুখ ভীষণ ব্যাপার!
তাহে মা আসিবে বঙ্গে,
দোলায় চড়িয়া রঙ্গে,
দেখো যেন তার ফল না হয় ভুগিতে।
কৃপাময়ী কৃপা করে রাখহ শান্তিতে॥

(৮)

এস মা ত্রিদিবেশ্বরী দাও মোক্ষপদ?
যদিও এ জীর্ণ দেহ,
অন্নহীন বঙ্গগৃহ,
যদিও বাঙ্গালী জাতি বিহীন-সম্পদ।
সভক্তি পূজিবে তবু তব রাঙ্গাপদ?

(৯)

এস মাতঃ দুঃখ-হরা দুর্গতিনাশিনি !
ভকতি-কুসুম তুলি,
রাঙ্গাপদে দিব ডালি,
রঞ্জিব হৃদয়-রক্তে চরণ দু'খানি।
ষড়রিপু দিব বলি করি জয়ধ্বনি ॥

(১০)

জননীর স্বর্ণ-রথ নামে ধরাতল।
এস মা ! এ দীন গেহে,
পূজিব পবিত্র দেহে,
ধোয়াইব রাঙ্গাপদ দিয়ে অশ্রুজল ;
যজ্ঞের ইন্ধন হবে এ দেহ দুর্ব্বল ॥

(১১)

ভক্তি-ভরে ডাক সবে জগত-জননী।
জ্বালিয়ে জ্ঞানের বাতি,
আরতি করহ নিতি,
শান্তি-প্রীতি-ভক্তি-স্রোতে ভাসাও অবনী ;
'জয় দুর্গা' বলি ডাক ভাই ও ভগিনী ॥

(১২)

অন্নপূর্ণা-রূপে মাতঃ ! এস এইবার।
ফল-শস্যে মনোহরা,
হাস্যময়ী হ'ক ধরা,
বহুক এ মরুভূমে শান্তি-সুধা-ধার ;
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে বিশ্ব ভাসুক আবার ॥

(১৩)

জয় জয় জগদম্বা পতিতপাবনী।
প্রণমামি মহাশক্তি,
সর্ব্বজীবে হোক্ প্রীতি,
ল'য়ে যাও মুক্তি-পথে জগত-জননি !
বহুক এ শুষ্ক প্রাণে ভক্তি-মন্দাকিনী ॥

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

জিজ্ঞাসা।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা, ছাড়িয়া সকল খেলা,
তোমারে ডাকিতে নাথ বসি হাত জুড়ি।
মন প্রাণ দিয়া প্রভু, ডাকিনা তোমায় কভু,
মুখে শুধু ছল করি বলি হরি হরি ॥
নরাকারে পশুসম, জানিনা শুচি-সংযম,
কেমনে সর্ব্বস্ব দিয়ে পূজি শ্রীচরণ ॥
লোক দেখান ভাণ করি, বসি শুধু হাত জুড়ি,
বহে নাকো চিত্তে কভু ভক্তি-প্রস্রবণ ॥
হবে কি সুদিন মম, ঘুচিবে মোহের তম,
পূজিব চরণ তব ছাড়ি প্রতারণা !
ছলনা ভণ্ডতা ছাড়ি, লোভ মোহ পরিহরি,
নিয়ত করিব আমি তব আরাধনা ?

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস গুপ্ত।

কালী।

মহাকাল পদতলে, নাশিছ অসুর দলে,
মাগো, তব ভয়ঙ্কর বেশ।
গলে শোভে মুণ্ডমালা, নেত্রে কোটি-সূর্য্য আলা,
আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশ ॥
সুরম্য মুকুট শিরে, কোটি শোভে নরকরে,
চারু মুখে অট্টহাস রাশি।
সালঙ্কার চতুর্ভুজে, বরাভয় দক্ষে রাজে,
বামদ্বয়ে দৈত্য-মুণ্ড, অসি ॥
রক্তাক্ত লোল রসনা, দিগ্বসনা শিবরামা,
মেঘপ্রভা তুলনা বিহীনা।
অতিসূক্ষ্মা নিরাকারা, স্বেচ্ছাবলে রূপ ধরা,
পূর্ণ কর ভক্তের বাসনা ॥

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী।



শারদোৎসব।

অনুপলের পর বিপল, বিপলের পর দণ্ড, দণ্ডের পর প্রহর চলিয়া গেল; মাস আসিল, মাসের পর মাস চলিয়া গেল, আসিল বৎসর। দেখিতে দেখিতে বৎসরও শেষ হইল। ধরামাঝে আবার সেই সুখের শরৎকাল উপস্থিত। কত নূতনে পুরাতন হইয়াছিল, আবার পুরাতনে নূতন হইল। দেখিতে দেখিতে মা সর্ব্বমঙ্গলা মহিষ-মর্দ্দিনীর বঙ্গে পদার্পণ করিবার কাল উপস্থিত হইল।

বর্ষা অপগত হইয়াছে। সুনীল স্বচ্ছ আকাশ মেঘমুক্ত। নদ নদী, পল্বল, পুষ্করিণীর জল অনাবিল। জলাশয়, দীর্ঘিকা ও হ্রদসমূহ শতদল পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জলজ কুসুমের সুবাসে সুবাসিত—বলাকা, রাজহংস, চক্রবাক চক্রবাকী প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গমের কলনাদ এবং মধুপানলুব্ধ মধুপকুলের মধুর গুঞ্জন মুখরিত! উদ্যান-বাটিকা—স্থলপদ্ম, সেফালিকা প্রভৃতি স্থলজ কুসুম গন্ধে আমোদিত।

জগজ্জননী সর্ব্বমঙ্গলা দশভুজা বঙ্গে আসিবেন বলিয়া প্রকৃতি রাণী, কাল ও দেশ মায়ের আগমনের উপযোগী করিয়া সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুদীর্ঘ সংবৎসর পরে মাতৃ-চরণ-দর্শন-লোলুপ সন্তানকে দর্শন দিবার জন্য মা আসিতেছেন। মা আমার দয়াময়ী আদীভূতা সনাতনী, তাঁহার শুভাগমনে নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, নীরস প্রাণ সরস হয়, রোগ-শোক জর্জ্জরিত চির ম্লান মুখে প্রসন্ন হাস্য ফুটিয়া উঠে।

এস মা দীনদয়াময়ি, দীনহীন অকৃতি সন্তানের হৃদয়-সিংহাসনে আসিয়া উপবেশন কর। এস মা, বিদ্যাদায়িনী বাণী, ধন-ধান্য-দায়িনী কমলা, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গজানন ও কুমার কার্ত্তিকেয়কে সঙ্গে লইয়া এ দরিদ্র বঙ্গভবনে পদার্পণ কর। ঐ শুন মা বঙ্গের গৃহে গৃহে ঢাক ঢোল শঙ্খ ঘণ্টার মধুর রবের সহিত কামিনী-

কলকণ্ঠের হুলাহুলি ধ্বনি সহ পুরোহিতগণের স্তোত্র গাথা সম্মিলিত হইয়া কেমন এক অপূর্ব্ব-ভাবের উন্মেষ করিয়াছে। সকলেই ভক্তি-গদগদ স্বরে বলিতেছে —

"অতি সৌম্যাতি রৌদ্রায়ৈ নমোস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।
নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥
ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী, ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা
ভূতেষু সততং তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥"

তোমার যত সৌম্যরূপ—যত রুদ্ররূপ তাহাকে নমস্কার করি। যিনি জগতের প্রতি-ষ্ঠাত্রী, যিনি ক্রিয়ারূপা, সেই দেবীকে নমস্কার করি; এই নিখিল জগতে যিনি সর্ব্বজীবের ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী, সেই বিশ্ব-ব্যাপিনী দেবীকে নমস্কার।

বিদ্যাসমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিত ত্বয়ৈতৎ
কাতে স্তুতি স্তব্যপরা পরোহিতঃ॥

হে দেবি, সমস্ত বিদ্যা তোমারই অংশ, চতুঃষষ্টি কলার সহিত সমস্ত স্ত্রীশক্তি তোমারই অংশ, মাতৃরূপা তোমাতেই জগৎ পূরিত, তোমা অপেক্ষা স্তুতি করার যোগ্য আর কে আছে—তোমার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ স্তুতি আর কি হইতে পারে।

তুমি বিশ্বেশ্বরী—বিশ্ব পালন করিতেছ, তুমি বিশ্বাত্মিকা বিশ্বধারণ করিয়া জীবসকলকে আশ্রয় দিতেছ।

হে দেবি, তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের বন্দনীয়া। যাঁহারা তোমাতে অনন্যচিত্ত, ভক্তি-নত, তাঁহারাই এ জগতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

ভারতবাসী চিরকালই ভক্তির কাঙ্গাল, ভক্তিবলে তাহারা ভক্তাধীনা জননীকে পূজা করিয়া ধন্য হইতে চায়—তাই আজ সিংহ-বাহিনী জগৎজননী জগদম্বা মায়ের আগমন আশায় আবাল, বৃদ্ধ, নর, নারীর হৃদয় ভক্তি-ভরে নাচিয়া উঠিয়াছে। সংসারের বিষময় জ্বালামালা দিবসত্রয়ের জন্য ভুলিয়া গিয়াছে। মহিষ-মর্দ্দিনী বিশ্ববিমোহিনী মায়ের আগমনে তাহাদের নিরাশ প্রাণে আবার আশার সঞ্চার হইয়াছে। পীড়িতের, বিপন্নের ও আর্ত্তের প্রাণে আবার নব-বলের সঞ্চার হইতেছে। হৃদয়ে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়া ঐ দেখ নয়ন-প্রান্তে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে।

বিপত্তারিণী দুর্গতি-নাশিনী মা! একটী বৎসরের পরে পুনরায় সন্তানগণকে দেখা দিতে আসিবেন। অভয়া! অভয় বাণীতে বঙ্গ-সন্তানের ভয় নিবারণ করিতে বঙ্গে আবির্ভূতা হইবেন। এস মা! দশ প্রহরণ-ধারিণী জননী দশভূজা এস; তোমার ভক্তগণের দুর্গতি দর্শন কর। শ্মশানবাসী মহেশ-ঘরণি! আজ যে তোমার ভক্ত-পুত্রের হৃদয় শ্মশানে পরিণত। তাই আজ তোমার ভক্তগণ শোকে, দুঃখে, অনাহারে ম্রিয়মান। মা পাষাণ[illegible]হিতে! আজ পাষাণ হৃদয়ে ভক্তের দুঃখ দর্শন কর। এত দুঃখে, এত কষ্টে পড়িয়াও আজ তাহারা ব্যাকুল অন্তরে তোমার আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছে, ভক্তি-বিমল পুষ্পে তোমার পূজা করিবে বলিয়া ঐ দেখ মা, যোড়করে, প্রেমাশ্রু-নেত্রে দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

এস, মা শুভঙ্করী! ভক্তের [illegible]

দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বসন্ত, কলেরা, জল-প্লাবনে তোমার ভক্তগৃহ আজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। ভক্ত-শিশু অনাহারে কঙ্কালাবশিষ্ট, বৃদ্ধা জননী পুত্রশোকে অবিরল অশ্রুধারায় অন্ধ। নবীনা পতিবিরহিনী, আজ পতিশোকে উন্মাদিনী। তাহাদের কোমলাঙ্গ আজ ধুলায় লুণ্ঠিত। পতি-বিরহিনীর বদন-শশী আজ বিষাদ রাহুতে আচ্ছাদিত। মাতৃ-হীনা দুধের শিশু নিরাশ্রয়। তাহারা ইহজীবনের মত মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত। তথাপি আমরা তোমার মুক্তিমূলাধার-ক্রোড়ে স্থান পাইব বলিয়া হৃদয়ের শোক-দুঃখ হৃদয়ে রাখিয়া, কাতর প্রাণে, সাশ্রু-নয়নে আজ তোমার ওপদ পঙ্কজে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে ব্যগ্র। এস মা! ভক্তের কাতর প্রাণের অঞ্জলি গ্রহণ কর।

মা! আনন্দময়ি! নিরানন্দ ভক্ত-গৃহে আজ আনন্দের প্রবল উৎস প্রবাহিত। বিপদনাশিনি! এস, ভক্তের বিপদরাশি নাশ কর। ত্রিতাপ-হারিণি! ভক্ত-বৃন্দের ত্রিতাপ হরণ কর। মা শান্তিদায়িনি! শোক-তাপ-ক্লিষ্ট ভক্তের হৃদয়ে চিরশান্তি প্রদান করিয়া তাহাদের পূজা গ্রহণ কর। ঐ দেখ, ভক্ত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিতেছে—"আগচ্ছ মদগৃহে দেবী, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ, মম পূজাং গৃহাণ।"

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দেব বর্ম্মা সরকার।

প্রকৃতি তত্ত্ব।

জীব-রাজ্য।

শম্বুকের উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীত হয় যে পৃথিবীতে প্রথমতঃ জীবের প্রকাশ সেই ভাবে হইয়াছিল। জীবনীশক্তি কি, ইহা বিশেষভাবে পর্য্যালোচিত হইলে, ইহা আরও স্পষ্টভাবে প্রতীত হইবে। জীবনীশক্তি মৌলিক, কি যৌগিক পদার্থ আগে দেখা যাক্। ইহা যে মৌলিক পদার্থ নহে, ইহা নিশ্চিত। যদি ইহা মৌলিক পদার্থ বলিয়া প্রমাণীকৃত না হয়, তবে ইহা যৌগিক পদার্থ,ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কতকগুলি পদার্থ সংযোগে যে পদার্থের উৎপত্তি, তাহা যৌগিক। এক্ষণে দেখা যাক্ কোন্ কোন্ পদার্থ সংযোগে ইহার উৎপত্তি সাধিত হইয়াছে।

আমাদের পাঠকবর্গ অহরহঃ বাষ্পীয় যান দেখিতেছেন। কেবল দেখিতেছেন না, তদুপরে আরোহণ করিয়া কত দেশ-দেশান্তর যাইতেছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ইহা কি সজীব পদার্থ? ইহা যে নির্জীব পদার্থ, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। নির্জীব বস্তু গতিহীন, ইহা সকলে অবগত আছেন। তবে ইহা কিরূপে গতিপ্রাপ্ত হইল? নির্জীব বাষ্পীয় যান কি প্রকারে গতিশীল হইল? ইহা নির্জীব হইলেও ইহা এরূপ দ্রুতগতিতে ও তীব্র-বেগে ধাবিত হয়, যে সজীব পদার্থে তাহা পারে না। ইহার গতির দ্রুততা ও বেগের তীব্রতার কাছে সজীব পদার্থ পরাজিত। বাষ্পীয়-যান, কি জন্য গতিশীল হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলে জীবনীশক্তি কি ও তাহা যে যৌগিক পদার্থ ইহা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

বাষ্পীয় যান বাষ্পবলে গতিশীল। বাষ্পীয়-যানের অগ্রভাগে যে কল সংযুক্ত থাকে, ইহাকে

ইংরাজীতে Locomotive Engine বলে। ইহাতে অনবরত বাষ্পের উৎপত্তি হয়। এবং ইহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, ইহাতে যে বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার বেগ এত অধিক হয় যে তাহারই প্রভাবে বাষ্পীয়-যান গতিশীল হইয়া থাকে। অগ্নি, জল, বায়ু ও কাষ্ঠ বা পাথুরে কয়লা দ্বারা উক্ত বাষ্পের উৎপত্তি সাধিত হয়। তাহা হইলে এক্ষণে দেখা গেল যে শক্তি দ্বারা বাষ্পীয়-যান গতিশীল, সেই শক্তি উপরোক্ত কয়েকটি পদার্থ সংযোগে উৎপন্ন হয়। তবে যে ইহা যৌগিক, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে গতিশীলতা জীবনের একটী লক্ষণ, তাহা হইলে বাষ্পীয়-যান জীবনের একটা লক্ষণাক্রান্ত, ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। যেরূপ বিবিধ পদার্থ সংযোগে শক্তির উৎপত্তি সাধিত হইয়া কলের গাড়ী চলচ্ছক্তি সম্পন্ন হইয়াছে, সেরূপ বিবিধ পদার্থ সংযোগে জীবদেহে জীবনী শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। জীবদেহ জড়ময়। স্বীয় জীবন রক্ষার্থ জীব অনবরত নিশ্বাস দ্বারা বাহ্য জগৎ হইতে বায়ুগ্রহণ করিতেছে। এই বায়ুর সহিত অম্লজান গ্যাস (Oxyzen) জীব-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই অম্লজান গ্যাস, ইহার জীবনীশক্তি রক্ষার প্রধান উপায়। জীবদেহে প্রচ্ছন্ন ও নিহিতভাবে যে বৈদ্যুতি-কাগ্নি বিদ্যমান আছে, উক্ত গ্যাস জীব-শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার উত্তেজনা করে। সেই উত্তেজনাপ্রযুক্ত জীবদেহে অগ্নি উৎপাদিত হইয়া থাকে। এবং তদ্দ্বারা জীবের ভূতময় দেহ অনবরত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেরূপ কলের গাড়ীর কলে পাথুরে কয়লা বা কাষ্ঠ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভষ্মীভূত হয়, সেইরূপ জীবদেহের অভ্যন্তরে সর্ব্বদা যে অগ্নি উৎপাদিত হইতেছে এবং ইহার যে ক্রিয়া হইতেছে, তাহাতে জীবের ভূতময় দেহ ক্ষয়িত হইয়া থাকে। এবং জীবদেহে যে শোণিত বিদ্যমান আছে, তাহা সলিলের কার্য্য করে। যেরূপ বাষ্পী-যানের কলে কাষ্ঠ বা পাথুরে কয়লা অগ্নিদ্বারা ভষ্মীভূত হইলে, নূতন কাষ্ঠ বা কয়লার প্রয়োজন হয়, সেরূপ উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় জীবদেহ যে অনবরত ক্ষয় হইতেছে, তাহা পূরণার্থ জীবের আহারের আবশ্যক হয়। যেরূপ উক্ত কলে নূতন কাষ্ঠ প্রদত্ত না হইলে উহাতে বাষ্প উৎপন্ন হয় না এবং বাষ্প উৎপন্ন না হইলে কলের শক্তির অভাব হয়, এবং সেই শক্তির অভাব হইলে তাহা অচল হইয়া পড়ে। আর তাহার নড়িবার ও চলিবার ক্ষমতা থাকে না। সেইরূপ জীব যদি আহাররূপে খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ না করে, তবে জীবদেহ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এবং এইরূপে কিছুদিন আহার গ্রহণ না করিলে, তাহা একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়।

কলে যে কাষ্ঠ বা পাথুরে কয়লা প্রদত্ত হয়, তাহা ভৌতিক পদার্থ। জীব আহার রূপে যে সামগ্রী ভক্ষণ করে, তাহাও ভৌতিক পদার্থ। উপরোক্ত দুই পদার্থ এক প্রকার ও এক জাতীয়। উক্ত কলে কাষ্ঠ বা কয়লা অগ্নিতে পুড়িয়া যে ভস্ম হয়, নূতন কাষ্ঠ বা কয়লা গ্রহণ সময় তাহা পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ জীব আহার রূপে যাহা ভক্ষণ করে, তাহার সারাংশ বা ভাগ জীবদেহ যে উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা নিরন্তর ক্ষয় করিতেছে, তাহা পূরণার্থ পরিগৃহীত হয়,

আর উহার অসার ভাগ বিষ্ঠা মূত্র দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

এক্ষণে দেখা গেল, কলের গাড়ীর কলের শক্তি উৎপাদনের যে ক্রিয়া, জীবের জীবনী-শক্তি রক্ষার্থ সেইরূপ ক্রিয়া। উক্ত কলের শক্তির উৎপত্তি হেতু যে সকল পদার্থের প্রয়োজন, জীবের জীবনীশক্তি রক্ষার্থও সেই সকল পদার্থের আবশ্যক। তবে উপরোক্ত কলে যে সকল পদার্থ প্রদত্ত হয় বা জীব যে সকল পদার্থ গ্রহণ করে,তাহা এক রূপ ও এক জাতীয় হইলেও তাহাদের আকারের ও ভাবের বিভিন্নতা আছে। একে একরূপ ভাবে প্রদত্ত হয়, ও অন্যের দ্বারা সে সব পদার্থ ভিন্ন ও পৃথক ভাবে পরিগৃহীত হয়। তাহাদিগের এই পার্থক্য ব্যতীত অন্য পার্থক্য কিছুই নাই। তাহা হইলে বুঝা গেল যে জীবের জীবনীশক্তি কতক গুলি পদার্থ-সংযোগে উৎপন্ন হয়; এবং তজ্জন্য ইহা যে যৌগিক পদার্থ, তদ্বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পৃথিবী প্রথমতঃ জীবশূন্য ছিল এবং যতদিন ইহা জীববাস-উপযোগী না হইয়াছিল, ততদিন ইহাতেও জীবের প্রকাশ হয় নাই। ইহার দ্বারা এই বুঝা যায় যে যতদিন পৃথিবীতে যে সব পদার্থ সংযোগে জীবের জীবনীশক্তি উৎপাদিত হয়, সেই সব পদার্থের সঞ্চয় না হইয়াছিল, ততদিন তথায় জীবের আবির্ভাব হয় নাই।

পৃথিবীতে প্রথমতঃ জীবের প্রকাশ কিরূপ ভাবে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতের ঐক্য নাই। তবে পূর্ব্বতন পাশ্চাত্য দার্শনিক-বৃন্দের মত যে আকাশে বায়ু-স্তরের উপরে যে ঈথর নামে এক পদার্থ আছে, তাহা হইতে চরাচরের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহারা ঈথরকে সৃষ্টি প্রকাশের মূল ও আদি কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে য়ুরোপে যে সকল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মনীষী জীবিত ও বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা উহাকে সৃষ্টি প্রকাশের উপকরণ মাত্র বলিয়া স্বীকার করেন, পরন্তু তাঁহারা ইহাকে সৃষ্টি প্রকাশের মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে ঈথর জ্ঞান চৈতন্য ও বুদ্ধিহীন ও নির্জীব পদার্থ। এরূপ পদার্থ দ্বারা সৃষ্টি প্রকাশ অসম্ভব। ইহার পশ্চাদ্দেশে কোন জ্ঞান ও চৈতন্যময় ও বুদ্ধিযুক্ত মহাপুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া ইহাকে পরিচালনা না করিলে, কোনপ্রকারে ইহার সাধ্য বা শক্তি ছিল না, যে এই বিশ্ব বিকাশ করে। সেই জ্ঞানময়, চৈতন্য-স্বরূপ ও বুদ্ধ পুরুষের দ্বারা ইহা পরিচালিত হইয়া এই চরাচর প্রকাশ করিয়াছে। এই মতই যুক্তিযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত মত যুক্তিমূলক নহে। প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক ও দার্শনিক-বৃন্দেরও এই মত।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ সার উইলেম ক্রুক্‌স ও বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন এবং বৈজ্ঞানিকগণের শিরোমণি অধ্যাপক নাইকোলা টেস্‌লা শেষোক্ত মত সমর্থন পূর্ব্বক ইহাই বিজ্ঞান জগতের চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ঈথর বিশ্বব্যাপী। ইহা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। এবং ইহা বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। ইহার ক্রিয়া বিস্ময়কর। তজ্জন্য য়ুরোপের পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিক

গণ ইহার বিস্ময়জনক কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইহাকে বিশ্ব প্রকাশের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বিশ্বে যাহা কিছু আছে, গ্রহ বল, উপগ্রহ বল, সূর্য্য ধূমকেতু বল, জীবজড়প্রাণী বল, সরিৎপতি হ্রদ বল, পাহাড়-পর্ব্বত-প্রস্তর বল, পত্র-পুষ্প ফল বল, ইহাদের কম্পন ও বিকম্পন, ইহাদিগের সকলের উৎপত্তি প্রমাণ পূর্ব্বক ইহাকে একবারে সৃষ্টির মূল হেতু বলিয়াছিলেন। আর ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঈথরকেই বিশ্বস্রষ্টা স্থির করিয়াছিলেন। এইরূপ মত যে একভ্রান্তিমূলক, তাহা তাঁহারা তখন বুঝিতে সক্ষম হয়েন নাই।

ঈথর ভৌতিক পদার্থ। ইহা অণুবিশিষ্ট। এক জন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন যে শক্তির ঘনত্বই অণু। ইহা অযৌক্তিক কথা নহে। শক্তি ও অণু এই বিশ্বপ্রকাশের মৌলিক প্রধান উপাদান পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঈথর এ দুয়ের মিশ্র। তাহা হইলে ঈথর হইতে যে বিশ্বপ্রকাশ তদ্বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইবার কারণ নাই। তবে উহা ভৌতিক পদার্থ এবং চৈতন্য, জ্ঞান ও বুদ্ধিহীন। ইহা নিজে বিশ্বপ্রকাশে অক্ষম। এ বিশ্বপ্রকাশ বিষয়ে কোন চৈতন্যময়, জ্ঞানময় ও বুদ্ধিমান মহাপুরুষের হস্তের ইহা একপ্রকার উপকরণ মাত্র, ইহা যুক্তিযুক্ত বাক্য।

য়ুরোপের অনেক বৈজ্ঞানিকও দার্শনিক পণ্ডিতগণের মত যে পৃথিবী প্রথমতঃ বাষ্পময় ছিল, পরে জলময় হয় এবং ক্রমে স্থলময় হইয়াছে। সৃষ্টি-প্রকরণ সম্বন্ধে আর্য্যপৌরাণিকগণের মতের সহিত ইহার কিছু অনৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। শেষোক্ত পৌরাণিকগণ বলেন যে পৃথিবী প্রথমতঃ জলময় ছিল। কিন্তু সর্ব্বাগ্রেই ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তাঁহারা আর কিছু বলেন না। পৃথিবী কি ভাবে প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পুরাণে নাই। তৎসম্বন্ধে এই স্থলে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন দেখি না। ইহা যে বহুকাল জলময় ছিল, এ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বুধমণ্ডলীর এক মত। ইহার জলমগ্ন থাকার অবস্থায় কোন্ সময়ে যে ইহাতে প্রথমতঃ জীবের প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা কেহই স্থির করিয়া বলিতে সক্ষম নহেন। তবে যে সকল দ্রব্য সংযোগে জীবনীশক্তির উদ্ভব হয়, যতদিন ইহাতে সেই সকল দ্রব্য সঞ্চিত না হইয়াছিল, ততদিন ইহাতে যে জীবের প্রকাশ হয় নাই—ইহা অনুভূত হয় এবং এই অনুভব যে যুক্তিমূলক, তাহাতে সংশয় করিবার কারণ দেখি না।

উপরোক্ত দ্রব্যসমূহ পৃথিবীতে সঞ্চিত হইলে তথায় প্রথমতঃ এরূপ জীবের প্রকাশ হইল, যাহার স্বভাব সলিল বাসোপযোগী। তখন তথায় আর স্থল ছিল না। তজ্জন্য স্থলচর জন্তুর উদ্ভব অসম্ভব। তখন তথায় এরূপ জন্তু সৃষ্ট হইল, যাহা জলে বাস করিতে সক্ষম, এই অনুমান যুক্তিসিদ্ধ। তাহা হইলে স্পষ্টভাবে প্রতীত হইতেছে যে পৃথিবীতে প্রথমতঃ যে জীবের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা জলচর। এই জলচর প্রাণীদিগের মধ্যে মৎস্যই প্রধান। সংখ্যাতে, জাতিতে, শ্রেণীতে, ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্বে মৎস্য অপেক্ষা কোন জলচর জন্তু শ্রেষ্ঠ নহে। তাহা হইলে পৃথিবীতে মৎস্যেরই যে প্রথম

প্রকাশ—ইহাই প্রতীত হয়। পাশ্চাত্য স্বভাব-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ও হিন্দু পৌরাণিকগণ এই মত পোষণ করেন। ইহাতে তাঁহাদিগের মতের বিন্দুমাত্র অনৈক্য নাই। তাহা হইলে উপরে যে বলা হইল যে পৃথিবীতে মৎস্যের প্রথম সৃষ্টি,ইহাই প্রকৃত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন যে আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টির বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আকাশ যেভাবে প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল, সেইভাবে এখনও আছে। ইহার যে কোন পরিবর্ত্তন বা বৈলক্ষণ্য সংঘটিত হইয়াছে, বোধ হয় না। তাহা হইলে প্রথমতঃ খেচর জীবের প্রকাশ না হইয়া মৎস্যের প্রথম সৃষ্টি হইল কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর সহজে দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রথম যে সকল দ্রব্যের সমাবেশ না হইলে ধরিত্রীতে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না, সে সকল বস্তু পৃথিবীতে আগে সঞ্চিত হইয়াছিল। পরে জীবের প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আকাশ শূন্য মাত্র। সেখানে কোন দ্রব্য বা বস্তু সঞ্চিত বা সংস্থাপিত হইতে পারে না। তজ্জন্য জীবনী-শক্তি উদ্ভবকারী পদার্থ সমূহ তথায় সঞ্চিত না হওয়া প্রযুক্ত মৎস্যের পূর্ব্বে খেচর জীবের উদ্ভব হয় নাই। এই উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া বলিতে পারেন যে আকাশে বৃহৎ বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহাদি সংস্থাপিত। জীবনী-শক্তি উদ্ভবকারী পদার্থ সকল তথায় স্থাপিত হইতে পারে না, ইহা অসম্ভব। একথা সত্য বটে, কিন্তু গ্রহাদি যে তথায় স্থাপিত, তাহা আকাশের ধারণা-শক্তিবলে নহে! তাহারা নিজ নিজ শক্তিতে তথায় স্থাপিত হইয়া আকাশ পরিভ্রমণ করিতেছে। এবং তাহারা নিজের প্রভাবে সেখানে স্থিত। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা যে স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই—বলা যায় না। যদি তাঁহারা মনযোগ সহকারে স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা নিশ্চয় জ্ঞাত আছেন যে, খেচর, জীবের উদ্ভব-স্থান মেদিনী, আকাশ নহে। তাহারা পৃথিবীতে সম্ভূত হইয়া আকাশ-মার্গে কেবল উড্ডীন হয় মাত্র।

মহা বিজ্ঞানবিৎ ও দার্শনিক হক্সিলি সাহেবের মত যে বর্ত্তমান জীবসমূহ পূর্ব্ববর্ত্তী জীবসমূহের ক্রমোন্নতি দ্বারা প্রকাশিত। তিনি ও য়ুরোপের অন্যান্য স্বভাব-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এবিষয় বিশেষ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়া জীব-জগতে বিবর্ত্তন বাদের প্রচার করিয়াছেন। প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ মহা পণ্ডিত ডারউইন সাহেব এই বিবর্ত্তন-বাদ প্রমাণার্থ সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে তদ্বিষয়ে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েন নাই—বলা যায় না। তবে অধুনাতন সমস্ত জীবই যে উক্ত বিবর্ত্তন-বাদের নিয়মানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। উক্ত নিয়মানুসারে মানব-জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাও তিনি প্রমাণার্থ বিশেষভাবে প্রয়াস করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন,এই প্রবন্ধে মানবজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সময় আলোচিত হইবে, সে সময় তদ্বিষয়ে তাঁহার অভিমতও বিস্তারিতরূপে

আলোচনা করা যাইবে। তবে উপরোক্ত পণ্ডিতবরেরা জীবের ক্রম-বিকাশ ও পূর্ব্ববর্ত্তী জীবের ক্রমোন্নতি দ্বারা আধুনিক জীবের উৎ-পত্তি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়া জীব-রাজ্যের এমন কতকগুলি তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা বহু পূর্ব্বে মানব-মণ্ডলী অজ্ঞাত ছিল। তাহা-দিগের সে সকল তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে আলোচিত হইবে।

এক্ষণে য়ুরোপে জীবন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মত যে জীবন ব্যতীত জীবনের উদ্ভব হয় না। এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের যে মত, জীবন-তত্ত্ব আলোচনাকারীদিগেরও সেই মত। বাস্তবিক কিছু না থাকিলে কিছুর উদ্ভব হয় না। নিতান্ত বিষয়ী লোক, অর্থোপর্জ্জান যাহার প্রধান লক্ষ্য, অর্থোপার্জ্জনের চিন্তা ব্যতীত যে আর কোন চিন্তা করিতে জানে না বা পারে না, সে ব্যক্তিও জানে যে কিছু না থাকিলে কিছু উৎপাদিত হয় না। মূলধন কিছু না থাকিলে অর্থ উপার্জ্জন হয় না। সেইরূপ কিছু থাকিলে—তাহা হইতে কিছুর প্রকাশ হয়। এ প্রবন্ধেও পৃথিবীতে জীবের প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে যে সকল পদার্থ-সংযোগে জীবনী-শক্তির উদ্ভব হয়, সে সকল বস্তু তথায় প্রথম সঞ্চিত হইয়াছিল, বলা হইয়াছে। এই বাক্য দ্বারা উক্ত বুধমণ্ডলীর মতই সমর্থন করা হইয়াছে, এবং উপরোক্ত পণ্ডিতগণও বিবর্ত্তন-বাদ সমর্থন করিয়া থাকেন।

পৃথিবী প্রথমে জলমগ্ন ছিল, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সে সময় ইহা কেবল মৎস্য ও অন্যান্য জলচর জন্তুর বাসযোগ্য ছিল। পরে ইহা স্থল-ময় হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে ইহাতে স্থলের প্রকাশ হইলে, প্রথমতঃ উভচর ও ক্রমে স্থলচর জন্তুর উদ্ভব হয়। এক্ষণে ইহাতে যে সকল উভচর, সরীসৃপ ও স্থলচর, চতুষ্পদ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, পৃথিবীতে স্থলের প্রকাশ হইবার কিয়ৎ সময় পরে, তথায় যে সকল উভচর, সরীসৃপ ও চতুষ্পদের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহারা উক্ত অধুনাতন উভচর, সরীসৃপ ও চতুষ্পদ জন্তু হইতে বিভিন্ন ছিল। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিশেষ গবেষণা ও চেষ্টা দ্বারা ইহা স্থির করিয়া-ছেন। ভূস্তরে, পর্ব্বত গুহায় ও অন্যান্য স্থানে উক্ত জীবসমূহের কঙ্কালাদি পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। এই মীমাংসায় সত্যের ভাগ যে অধিক, তাহা কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না। সেই সকল উভ-চরদিগের আকার বৃহৎ, প্রকাণ্ড ও ভয়ঙ্কর ছিল। এবং পৃথিবীর সেই যুগে পক্ষ বিশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরীসৃপ উদ্ভুত হইয়া পৃথিবীর গগণে বিকট শব্দে উড্ডীন্ হইত, এবং তখন একপ্রকার চতুষ্পদ জন্তুর উদ্ভব হইয়াছিল, যাহাদিগের শরীর অধুনাতন হস্তীদিগের শরীর অপেক্ষা চতুর্গুণ বৃহৎ ছিল। প্রথমোক্ত চতুষ্পদ জন্তুরা অধুনাতন হস্তীর ন্যায় প্রায় আকার বিশিষ্ট ছিল। কিন্তু তাহাদিগের বংশ এক্ষণে একবারে লুপ্ত হইয়াছে।

যে সময় পৃথিবীর আকাশে উপরোক্ত বৃহৎ বিকটাকারযুক্ত সরীসৃপগণ বিকট শব্দ করিয়া উড্ডীন্ হইত, তখন সে দৃশ্য কি বিভীষিকাময় ও ভীষণ ছিল, ইহা কল্পনা করিলে, মনে বিষম ভীতির সঞ্চার হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তখন পৃথিবীতে মনুষ্যের উদ্ভব হয় নাই।

মানব-স্বভাবের প্রিয়-পুত্র। মানব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সে ভয়ঙ্কর ও বিভীষিকাময় দৃশ্য অহরহঃ অবলোকন করিয়া ভয়ে ও ত্রাসযুক্তভাবে কাল যাপন করিবে, ইহা স্বভাবের অভিপ্রায় নহে বলিয়া পৃথিবীতে মানবের অভ্যুদয় হইবার পূর্ব্বেই সেই সকল জীবের একবারে উচ্ছেদসাধন হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে দেখা গেল যে পূর্ব্বতন অনেক জীব-বংশ একবারে লুপ্ত হইয়াছে, এবং আবার অনেক অভিনব জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদ্বারা বিবর্ত্তন-বাদীদিগের মত অনেকটা সমর্থিত হইতে পারে। তাঁহারা বলিতে পারেন যে পূর্ব্ববর্ত্তী জীব ক্রমোন্নতি দ্বারা বিবর্ত্তিত হইয়া পরবর্ত্তী জীবে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কেবল মুখে এ বাক্য বলিলে চলে না। পূর্ব্বতন কোন নিকৃষ্ট জীব উন্নত হইয়া পরবর্ত্তী কোন উৎকৃষ্ট জীবে পরিণত হইয়াছে, ইহা বলিলে যে সেই নিকৃষ্ট জীব যে ভাবে, যে প্রকার ও রূপে, ও যে শৃঙ্খলার সহিত ও যে নিয়মানুসারে ক্রমে ক্রমে পর পর উন্নত হইয়া উৎকৃষ্ট জীবে পরিণত হইল, তাহার প্রত্যেক শৃঙ্খলা প্রদর্শন করা প্রয়োজন, নতুবা তাহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। কোন নিকৃষ্ট জীব একবারে কোন উৎকৃষ্ট জীবরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না, ইহা প্রকৃতি পর্য্যালোচনাদ্বারা বুঝা যায়। কোন নিকৃষ্ট জীবকে উৎকৃষ্ট জীবে পরিণত হইতে হইলে ক্রমে ক্রমে হইবে অর্থাৎ—সেই নিকৃষ্ট জীবের যেরূপ স্বভাব, যেরূপ গঠন ও আকার সে সব ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া পরিশেষে উৎকৃষ্ট জীবরূপে প্রকাশিত হইবে, ইহাই বিবর্ত্তন-বাদীদিগের মত। এবং ইহা প্রমাণার্থ তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। জীবন-তত্ত্ববিৎগণ বলেন যে পূর্ব্ববর্ত্তী জীব হইতে পরবর্ত্তী জীবের প্রকাশ—এ বাক্য সম্পূর্ণভাবে সত্য হইতে পারে না; কারণ পূর্ব্বতন অনেক জীব একবারে লোপ হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগের বংশ পৃথিবীতে আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহা হইলে স্পষ্টভাবে প্রতীত হইতেছে যে, তাহাদের পরে অনেক অভিনব জীবেরও প্রকাশ হইয়াছে। তাহা হইলে অধুনাতন সমস্ত জীব যে পূর্ব্ববর্ত্তী জীব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,এ বাক্য প্রকৃত নহে। পৃথিবীতে জীব সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যে সকল জীব একরূপ ও এক ভাবে এই বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে, সেই সকল জীব স্বজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির নিয়মানুসারে জীবউৎপাদন করিতেছে। যে জাতীয় জীব, সে সেই জাতীয় জীব উৎপন্ন করিতেছে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। তাহা হইলে জীবন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের বাক্য সম্পূর্ণ সত্য না হইয়া আংশিক ভাবে সত্য বলিয়া বোধ হয়।

স্বভাব-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যে বিবর্ত্তনবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এই মত যুক্তির সার ভিত্তিতে সংস্থাপিত। তাঁহাদিগের মত প্রকৃত বলিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহারা অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এবং অনেক স্থলে তদ্দ্বারা বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন যে তাহাদিগের মত অপ্রকৃত ও যুক্তিহীন নহে। তবে পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত জীব যে বিবর্ত্তনবাদের নিয়মানুসারে বিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক জীবে

প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহা সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

কোন নিকৃষ্ট জীব ক্রমোন্নতি দ্বারা কোন উৎকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়,এই বাক্য যে বিবর্ত্তন-বাদীরা বলিয়া থাকেন, তাহা কেবল তাঁহাবা জীবের স্থূল ও ভৌতিক দেহ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন। ইহাদিগেব আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাহারা কিছু বলেন না।

নিকৃষ্ট জীব আত্মিক, কিম্বা আত্মাহীন ইহা দর্শন জগতেব কূট প্রশ্ন। তবে নিকৃষ্ট জীব হউক আর উৎকৃষ্ট জীবই হউক—সকলই যে এই অনন্ত বিশ্বব্যাপ্ত পরমাত্মাব ভিন্ন ভিন্ন ভাবেব প্রকাশ মাত্র, এই কথা যদি সকলে স্বীকাব কবেন. তবে কোন জীবই আত্মাহীন নহে।

জীবদেহ কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত কিম্বা ইহাব লক্ষণ কিরূপ, তাহা এক্ষণে আলোচনা করা যাউক।

জীবদেহ যে বাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বাবা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ইহাতে অম্লজান, জলজান, নাইট্রজান ও অঙ্গার প্রভৃতি অনেক ভৌতিক পদার্থ আছে। কোন্ কোন্ ভৌতিক পদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা জীবদেহের উৎপত্তি, রসায়ন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা সে সমস্ত পদার্থ নির্দ্দেশ করিতে এখনও সমর্থ হয়েন নাই। যে কয়েকটি ভৌতিক পদার্থ স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাদিগের নাম উপরে প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ। ইহা অহর্নিশ ক্ষয়প্রাপ্ত হই-তেছে। জীব আহাররূপে যে সব ভৌতিক পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্দারা সেই ক্ষয় পূরণ হইয়া থাকে। ইহা এরূপ ক্ষয়শীল, যে দ্বাদশ বৎসব পবে ইহার পূর্ব্বতন ও পুরাতন অণুর একটী মাত্র অণু ইহাতে থাকে না, এবং ইহা অভিনব অণু-পুঞ্জে পূর্ণ হয়। তজ্জন্য দ্বাদশ বৎসর যদি কোন ব্যক্তিকে দেখা না যায়, তবে তৎপরে তাহাকে দেখিলে চেনা দুষ্কর হয়।

তৃতীয়তঃ। বাহ্য জগতের সহিত ইহার অনববত সংঘর্ষদ্বারা ইহা ক্রমাগত পতনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। শেষে ইহা একবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ইহার এই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য। ইহা কোনরূপে নিবাবিত হয না, ইহাই জীবের মৃত্যু।

শ্রীকানাইলাল নাগ।

অবসান।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণা-গৃহ।

রাম ও কালপুরুষ।

কালপুরুষ। (স্বগতঃ) দুর বনে পথহারা
কুরঙ্গ যেমতি
সভয়ে প্রবেশে ধীরে সিংহের গুহায় ;
তেমতি লক্ষ্মণ বীর মন্থর গমনে,
আসিছে এ গৃহ-মাঝে।
শুনি দূরে গরজে দুর্ব্বাসা,
"আশা পূর্ণ হইল নিশ্চয়।"
কেমনে ভ্রাতার হেন বর্জ্জিবেন রাম
অসম্ভব হইতেছে বোধ।

দেখি বহু দূর নহে আর—
মেঘ-পাশে চপলার হয়েছে বিকাশ ;
বাকী শুধু জলদ গর্জ্জন।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম। (সচকিতে) হায় ভ্রাতঃ !
একি মতিভ্রম,
প্রতিলঙ্ঘন কি হেতু
করিলে আজ্ঞা মোর ?
সন্ন্যাসীর ভাষে ঘোর সত্যপাশে
বন্দী আছি জানতো সকলি,
তবে কেন এলে গৃহ-মাঝে ?
কি ভীষণ সর্ব্বনাশ ঘটালে রামের।

লক্ষ্মণ। কিবা সর্ব্বনাশ দেব।
ক্ষুদ্র এই দাসের জীবন
জনমের মত
উৎসর্গ করেছি তব পায়।
দ্বারে দাঁড়াইয়া ঋষি দুর্ব্বাসা বিষম
যাচে আসি রাজ-দরশন।
বিনয়েতে জানাইনু সত্যের কাহিনী,
ক্রোধে মুনী অনল সমান।
ঘোর অভিশাপে সূর্য্যবংশ
ধ্বংসিতে উদ্যত,
নহে মতিভ্রম মোর
বিস্মৃতি করেনি গ্রাস সত্যের স্মরণ।
ভুলি নাই ভবিতব্য কিবা,
সত্যের পালন হেতু তব।

রাম। হায় ! একি দেবের ছলনা,
প্রবঞ্চনা করে কি দেবতাকুল ;
মানব কি দেব করে ক্রীড়া পুত্তলিকা,
প্রাণাধিক ! তুই কেন এলি ?

জ্বলি ব্রহ্ম-কোপানল করি না
এ অযোধ্যা ভস্ম অবশেষে
সূর্য্যবংশ ধ্বংস নাহি হ'ত ক্রোধানলে,
তাহ'লে ত সত্য মম হ'ত না লঙ্ঘন।

লক্ষ্মণ। কেন দেব ! সত্যের লঙ্ঘন কেন হবে !
কেন রবে রামনামে কলঙ্ক-কালিমা ?
চির দাস আজ্ঞাধীন তব
আজ্ঞা তব করিবে পালন
এ দাসেরে করিয়া বর্জ্জন
সত্য রক্ষা কর রঘুমণি।

রাম। অহো বজ্র ! সত্য বজ্ররূপে গঠিত,
কি হৃদয় আমার,
এখনও বিদার, হ'লনা শুনি এ বাণী ?
লক্ষ্মণে বর্জ্জিয়া যেই সত্যের পালন
হেন সত্য চরণে দলিব শতবার।

(দুর্ব্বাসার প্রবেশ)

দুর্ব্বাসা। মহারাজ, এখন ওসব গৃহস্থালীর কথা রাখ, ওসকল এর পর হবে, এখন ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা কর, আতিথ্য সৎকার কর। লক্ষ্মণ ! তোমার যে কাজ, তা হয়েছে, এখন যাও, দ্বার-রক্ষা করগে, তোমার ব্যবহারে আমি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি।

লক্ষ্মণ। যাই—জনমের মত যাই।
আজি কিবা আনন্দের দিন
এ জীবন দিয়া বিসর্জ্জন
রাম-সত্য করিব পালন।

(প্রস্থান)

রাম। (দুর্ব্বাসার প্রতি) প্রভো, আজ জীবন পবিত্র হ'ল। চরণ-রেণু প্রদানে দাসকে

কৃতার্থ করুন। কি ইচ্ছায় প্রভুর আগমন?

দুর্ব্বাসা। ইচ্ছা কিছু ভোজন, আজ এক বর্ষ অনাহারী আছি। আমার উদর পূর্ণ ক'রে ভোজন করাও।

রাম। (স্বগতঃ) বুঝিলাম এই আমার লীলা সাঙ্গের সূত্রপাত। অনাহারী। এক বর্ষ অনাহারী। কি অসম্ভব। মিথ্যা, কেবল অদৃষ্টের চিত্রপটে উদ্ঘাটিত চিত্র মাত্র। (প্রকাশ্যে) প্রভু করুণাময়। তাই এই দাসানুদাসের প্রতি অনুগ্রহ, এ অনুগ্রহে আজ ধন্য হ'লাম।

দুর্ব্বাসা। আচ্ছা, ধন্য হ'লে ভালই। এখন আহারের উদ্যোগ কর, পরামর্শ টরামর্শ এর পর যা হয় করো।

রাম। যে আজ্ঞা, তবে প্রভু দাসের সঙ্গে আগমন করুন। (সন্ন্যাসীর প্রতি) আপনি ইচ্ছা ক'রলে এক্ষণে বিদায় হ'তে পাবেন।

কালপুরুষ। তথাস্তু।

(রাম ও দুর্ব্বাসার প্রস্থান)

কালপুরুষ। (স্বগতঃ) আশা ত পূর্ণ হ'ল, দেবগণের ইচ্ছা ত সাধিত হ'ল। লক্ষ্মণ বর্জ্জনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাক্‌লো না। দেখি, এ শোক-চিত্রের শেষ অভিনয় কি হয়। দেখে, দেবগণকে এ সুসংবাদ দিই গে। কিন্তু হায়, কি ভয়ানক রোদন-ধ্বনি উঠবে। এ আনন্দধাম একবারে নিরানন্দ সাগরে ভাসমান হবে। তা ভেবে আর কি হবে, এখন কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হই।

(প্রস্থান)

পটক্ষেপন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যার প্রান্তদেশ—সরযূ-তীর।

কালপুরুষ ও মায়া।

কালপুরুষ। দেবি। মনোরথ সিদ্ধপ্রায় এবে,
হবে ত্বরা লক্ষ্মণ বর্জ্জন।

মায়া। শুনেছি সে নিদারুণ কথা,
বড় ব্যথা পেয়েছেন রঘুনাথ
দুর্ব্বাসার দারুণ ছলনে
মর্ত্ত্যের বন্ধনে, বন্দী এবে রামচন্দ্র।

কালপুরুষ। দেব-মায়া কে বুঝিবে বল
লক্ষ্মণ-বর্জ্জন সূত্র ধরি
রামলীলা হবে অবসান
মায়াতীত নররূপী হরি
করিবেন আপনি তাহার পথ।

মায়া। সত্য কি লক্ষ্মণ তবে ত্যজিবে জীবন?
ধরামাঝে নাহি কি তাঁহার ঠাঁই?
রামরাজ্য করি পরিহার
দূরে যাবে লক্ষ্মণ সুমতি
আহা! তবু বাঁচিবে জীবন।

কালপুরুষ। আর কোথা যাবে দেবী
সসাগরা ধরণী মাঝারে
সর্ব্বত্র রামের অধিকার,
রামরাজ্য ছাড়ি নাহি দাঁড়াবার ঠাঁই।
তাই প্রাণ ত্যজিবে লক্ষ্মণ
কাল সন্ধ্যাকালে
বশিষ্ঠাদি যত মুনীগণ
কত প্রবোধিল রঘুনাথে,
লক্ষ্মণেরে বুঝাইলেন কত
কিন্তু হায় বৃথা অনুরোধ
কার বাক্য না শুনে লক্ষ্মণ।

মায়া। হায় দেব! না জানি কেমনে
পাষাণ হইল রঘুনাথ
কোন্ প্রাণে সে হেন ভ্রাতায়
ত্যজিবেন জনমের মত,
রাজ্য ত্যজি ভ্রাতৃ-সেবা তরে
জননীর স্নেহ-অঙ্ক ছাড়ি,
ছাড়ি বঁধু সুশীলা উর্ম্মিলা
ছায়া-সম ভ্রমিত ভ্রাতার সনে।
সে লক্ষ্মণ হইল কানন-চারী
রামনাম সদা যার ধ্যান
হেন স্নেহময় সহোদরে
কোন্ প্রাণে দিবে বিসর্জ্জন।
রঘুনাথ নির্দ্দয় নিষ্ঠুর,
বৃথা দয়াময় নাম তাঁর।
কালপুরুষ। দয়া চেয়ে সত্য বড় দেবী
নির্দ্দয় নহেন রঘুনাথ,
দয়াবশে সত্য ধর্ম্ম করিলে হেলন
রাজধর্ম্ম হবে বিদলিত,
রাম নামে লাগিবে কলঙ্ক ছায়া,
ধরা মাঝে সত্য-ধর্ম্ম করিতে প্রচার,
অবতার নর-রূপ ধরি
সাজে কি তাঁহার দেবি সত্যের লঙ্ঘন,
তাই এই লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।
লোক শিক্ষা হেতু বিশ্ব হবে বিমোহিত,
মর্ত্তবাসী স্মরিবে অনন্ত কাল
মহাকাল নিজ বক্ষে করিবে বহন,
জয় ধ্বনি উঠিবে রামের নামে,
লক্ষ্মণ-বর্জ্জন করি রাম,
শেখাবেন সত্যের মহিমা।
মায়া। ছিঁড়িয়া হৃদয়-তন্ত্রী অতল সাগরে
বিসর্জ্জিয়া স্নেহ ভালবাসা
সত্যের মহিমা সংকীর্ত্তন;
হেন সত্য ডুবুক অতল জলে,
সঙ্গে লয়ে কুসুম-হাসিনী উর্ম্মিলায
বনে যাক্ লক্ষ্মণ সুমতি
কিংবা সেই সাগরের পারে
লঙ্কাপুরে করুক গমন
নাহি রাম-রাজ্য তথা।
অথবা কিষ্কিন্ধ্যাপুরে সুগ্রীব আলয়ে,
পত্নীসহ করুক বসতি।
নহে দূরে জনকের পুর
সেখানে কি নাহি দাঁড়াবার স্থল?
প্রাণ কাঁদে হে কৃতান্ত
ছাড়িব না রামের হৃদয,
মমতায আবারব ত্বরা
অনাথিনী কাঁদিবে উর্ম্মিলা বধু
পারিব না সহিতে হৃদযে,
দেব-কার্য্যে দিব বাধা
ফিরে যাও অমর ভুবনে,
হ'ল নাক লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।
কালপুরুষ। কেন দেবি! স্নেহ বশে
ভুলিছ আপনা
কেবা তুমি - কেবা আমি
লীলাময় আপন ইচ্ছায়
করিছেন এ সকল লীলা
লক্ষ্মণের অস্ত্র-বিসর্জ্জন
অসামান্য ভ্রাতৃ অনুরাগ
ভাবী মানবের সুখ তরে;
প্রতি ঘরে ঘরে
লেখা রবে জ্বলন্ত ভাষায়

অবতার লোক-শিক্ষা তরে তাঁর
ভাল না হ'লে, অন্তর্য্যামী হয়ে,
হেন সত্য করেন কি রাম ?
লক্ষণের নিদারুণ পণ
রাম-রাজ্য ছাড়ি
না রবে পৃথিবী যাবে,
দিবে প্রাণ, পশিয়া সরযু জলে
চল গিয়া শূন্যপথে অলক্ষ্যেতে থাক,
দেখি ঘোর শোক-অভিনয়।

মায়া। দেখ তুমি হে কৃতান্ত
শুন বহু রোদনের ধ্বনি—
বজ্রসার হৃদয় তোমার।
দেখ তুমি শোক-অভিনয়,
পশি আমি সুদূর কানন মাঝে—
আহা! দেখিলাম উপবনে,
ক্ষুণ্ণ মনে দাঁড়ায়ে ঊর্ম্মিলা সতী
ম্লান মুখ যেন কি চিন্তার বেগে
পথ-হারা হরিণীর মত
কভু চায় চারিদিক পানে
কভু ভ্রমে প্রতি তরুতলে,
অশ্রুজলে কভু বা ভাসিছে মুখখানি
দাঁড়াইয়ে লতা-কুঞ্জ পাশে
দেখিলাম দারুণ বেদনা তার,
দুখ-ভার অসহ হইল
পলাইয়া আসিলাম হেথা।

কালপুরুষ। কি করি কর্ত্তব্য স্মরি
আছি এই খানে।
যাও তুমি পশ দূর বনে
আমিও ত্বরায়
অনুগামী হইব তোমার।
অভিনয় প্রায় শেষ,
দেখে যাই যবনিকা পড়ে কত দূরে।

উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীমদেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

অতিথি।

চারুচন্দ্র বসু হাজারিবাগের একজন বেশ গণ্যমান্য লোক। সদর রাস্তার উপর চারুবাবুর বাটীখানি; স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা বিভাকে লইয়া তাহার সংসার।

চারুবাবু ছোট্টরকমের বেঁটে মানুষটী; বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ, মুখশ্রী সুগম্ভীর ধর্ম্মভাব-ব্যঞ্জক মস্তকের মধ্যস্থলে একখানি প্রকাণ্ড ইন্দ্রলুপ্ত; বোধ হয় তাঁহার মত ধর্ম্মভীরু লোক এ কলি-যুগে আর নাই!

হাজারিবাগে এমন লোক নাই যে, চারুবাবুর বাটীতে একদিনও 'পাত' পাড়ে নাই, কত বিদেশীকে আশ্রয় দিয়া খাওইয়া পরাইয়া চাকুরি করিয়া দিয়াছেন, কত গরীবের ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অতিথি অভ্যাগতকে চারুবাবু গুরুপুত্রের মত শ্রদ্ধা যত্ন করেন, সেকালের বুড়ীরা বলিতেন—"ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব কি ?" সে সত্য, চারুবাবুর অতিথি-সেবার ত্রুটী নাই, অতিথিরও অভাব নাই, প্রত্যহ অন্ততঃ পক্ষে দশ বারজন অতিথি আসিবেই আসিবে।

বিভা মেয়েটী বড় লক্ষ্মী, বয়স বছর বার তের, প্রভাতে স্নান করিয়া এলোচুলে ঠাকুরে

লাল চেলী পরিয়া গলায় ফুলের মালা দিয়া সে যখন শিবপূজা করিতে বসে, তখন যেন প্রকৃত গৌরীদেবীর মতই দেখায়।

অনেকদিন আগে একবার চারুবাবুর বাটীতে রাত্র আটটার সময় একজন অতিথি আসিয়াছিল, তাহার বেশ-ভূষা বেশ সম্ভ্রান্ত জনের মত দেখিয়া চারুবাবু তাহাকে ভদ্রলোক ভাবিয়াছিলেন। অতিথি আশ্রয় ভিক্ষা করিল বলিল—"মহাশয় বিদেশে আসিয়া বড়ই কষ্টে পড়িয়াছি, সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়া কোথাও উপযুক্ত আশ্রয় পাই নাই, এই সন্ধ্যাবেলায় একজনের মুখে আপনার সদনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া এখানে আসিলাম। মহাশয়, যদি কৃপা করিয়া আজিকার রাত্রের মত আমাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে চির-বাধিত থাকিব—যদি পারি ত প্রাণপণ করিয়াও আপনার প্রত্যুপকার করিব। ক্ষুদ্র মূষিক যখন পশুরাজ কেশরীর প্রত্যুপকার করিতে পারিয়াছিল, তখন হইতে পারে এ গরীবের দ্বারায়ও আপনার কোনও না কোনও উপকার হইবে।

"না, না, আপনি ওসব বলিবেন না, আপনি যে দয়া করিয়া এ দীনের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহাতেই আমি পরম বাধিত। যতদিন ইচ্ছা থাকুন, তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। আপনার উপযুক্ত সেবা আমরা করিতে পারিব না, তবে আমার গরীবের ঘরে বিদুরের খুদ—এতেই যদি আপনি সন্তুষ্ট হন, তবে তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কি হতে পারে?"

গৃহিণী ঠাকুরাণী চারুবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওগো, ওকে রেখো না লোকটাকে আমার যেন কেমন কেমন ঠেকছে। নিশ্চয় বেটা কোনও জোচ্চোর—রাতে সব চুরী করে নিয়ে পালাবে"

চারুবাবু গৃহিণীর কথায় কাণে আঙুল দিয়া বলিলেন—"রামঃ! তুমি বল কি!! খবরদার -খবরদার, ও পাপ-কথা আর মুখে এনো না গিন্নি! অতিথি দেবতা!"

তারপর যথাবিহিত অতিথি-সেবা করা হইল, আহারাদির পর খাস্ চারুবাবুর ঘরে তাহার শয়নের ব্যবস্থা হইল, সেই ঘরে একটী লোহার সিন্দুক ছিল। অতিথি কথাপ্রসঙ্গে চারুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ ঘরে এ সিন্দুকটী কেন?'

চারুবাবু সরলভাবে বলিলেন—"গৃহিণীর যা' খানকতক গয়না আছে, তা' ঐটেতেই আছে। আচ্ছা ভায়া, তুমি এখন বিশ্রাম কর, আমি শুই গে। কাল প্রাতে সাক্ষাৎ করব।"

চারুবাবু ভিতরে গিয়া শুইলেন।

পরদিন প্রভাতে সকলে উঠিয়া দেখিল—"লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া গহনার বাক্স লইয়া অতিথিঠাকুর চম্পট দিয়াছেন।

চারুবাবুর উপর গৃহিণীর ত রাগের আর সীমা ছিল না, তাঁহাকে কত কি দুর্ব্বাক্য বলিয়া ফেলিলেন, ভবিষ্যতে অতিথি আসিলে তিনি তাহাদের সম্মার্জ্জনীর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিবেন বলিয়া মত জ্ঞাপন করিলেন।

আজিও গৃহিণী ঠাকুরাণী মাঝে মাঝে চারুবাবুকে সেই কথা তুলিয়া আর অতিথি

রাখিতে নিষেধ করেন, চারুবাবুর কিন্তু অত বড় ব্যাপারটাতেও অতিথি-ভক্তির হ্রাস হয় নাই, গৃহিণী রাগিলে চারুবাবু তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন—"নাগো না, একটা বদ্‌মাইস বলে কি সবই খারাপ হবে। অতিথি ফিরাতে নাই—অমন করো না তুমি।"

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি। দুপুরবেলা চারুবাবুর বৈঠকখানার চারিদিকের জানালায় খসখসের পরদা দেওয়া, ভিতরে টানাপাখা চলিতেছে। বৈঠকখানায় বন্ধুবর্গের সহিত বসিয়া চারুবাবু পাশা খেলিতেছিলেন। বাহিরে আম-পাকান' রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, রহিয়া রহিয়া গরমের হাওয়া বহিতেছিল। সেই সময় দিব্যকান্তি সুন্দর সন্ন্যাসী-বেশী একজন যুবক আসিয়া চারুবাবুর নিকট আশ্রয় চাহিল।

চারুবাবু তখনি তাহাকে আশ্রয় দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। তারপর তাহার পরিচয়ে জানিলেন—সে একজন সুশিক্ষিত ভদ্রলোক, তাহার নাম রমানাথ দত্ত, স্ত্রীর অকস্মাৎ মৃত্যুর পর হইতেই বৈরাগী হইয়া বেড়াইতেছেন। যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনার সহিত চারুবাবু তাহাকে আশ্রয় দিলেন।

পরদিন প্রভাতে শিবপূজা করিয়া গৌরী দেবীর মত মোহিনীবেশে বিভা যখন আসিয়া সন্ন্যাসীর পদ-বন্দনা করিল; সন্ন্যাসী যুবক তাহাকে দেখিয়া সহসা হৃদয় হারাইল, প্রায় তিন বৎসর কাল সে সংসার-সুখে জলাঞ্জলী দিয়াছিল, বিভাকে দেখিয়া আজ তাহার আবার সংসার করিতে সাধ গেল, সে মনে মনে কি একটী দুরাশা স্থান দিল।

তারপর ক্রমাগত দুই সপ্তাহ কাল সে বিভাব ভক্তি-শ্রদ্ধা ও যত্নে আপনাকে বড় সুখী করিতে লাগিল। বিভা যতক্ষণ তাহার সম্মুখে থাকিত, ততক্ষণ সে বেশ প্রফুল্ল থাকিত, বিভা চলিয়া গেলে জগৎ তাহার পক্ষে অন্ধকার বলিয়া বোধ হইত, প্রথম প্রথম সে একবার বিভাকে দেখিলেই সুখী হইত, এখন কিন্তু সারাদিন দেখিয়া, সারাদিন গল্প করিয়াও তাহার সাধ মিটে না। যত দেখে, ততই দেখিতে মন যায়—সে যে এক অতৃপ্ত বাসনা!

যত তাহার চিত্ত-বিপর্যয় হইতে লাগিল, ততই সে অকারণে আপনাকে অপরাধী মনে করিতে লাগিল। আগে সে নিঃসঙ্কোচে বিভার সহিত কথা কহিত, কিন্তু এখন তাহার সহিত কথা কহিতে যাইলে কেমন একটা সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। মনেতে দেখিবার ইচ্ছা ষোল আনা, অথচ সে মুখ তুলিয়া বিভার দিকে একটীবারও যেন ভাল করিয়া চাহিতে পারে না—ভয় হয়, পাছে যদি কেহ তাহার মনের ভাব বুঝিয়া লয়!

রমানাথ অনেক ইংরাজি নভেল পড়িয়াছিল। সে যে ভালবাসার পথে পদার্পণ করিয়াছে, তাহাও সে বেশ বুঝিল, প্রথম প্রথম রমানাথ মনের সহিত বিস্তর যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু এখন হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, বুঝিয়াছে তাহার হৃদয় আর শাসনের বশে থাকিবে না। সুতরাং আর চেষ্টা করে না, মনে করে 'ভেসেছি ত ভেসে যাই।' দিনের বেলায় বসিয়া বসিয়া সে ভাবিত—বিভার সে হাসিমাখা সুন্দর মুখখানি! বিভার মধুমাখা মিষ্ট কথাগুলি, আহা! মরি কি সুন্দর!

তরু-শাখে কোকিল ডাকিত—কুহু কুহু কুহু, সে শুনিত—বিভা ! বিভা ! বিভা !

রাত্রে শয়ন করিয়া রমানাথ স্বপন দেখিত যেন বিভার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, সে হাসিয়া হাসিয়া বিভাকে কত কথা বলিতেছে, বিবাহের পূর্ব্বে বিভার জন্য সে কত আকুল হইয়াছিল, সেই সব কথা বলিতেছে, আর বিভা যেন আনত-আননে সব শুনিতেছে, মাঝে মাঝে ঘোমটার ভিতর বিভার গোলাপী অধরে মরমের মৃদু-হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে।

দুই দিন হইল বিভার জ্বর হইয়াছে, তাই আর সে বাহিরে আসিতে পারে না।

সন্ন্যাসীঠাকুর যখন প্রথম শুনিলেন—বিভার জ্বর—সে বাহিরে আসিতে পারিবে না, তখন অকস্মাৎ তাঁহার বহুদিনের শুষ্ক নয়ন হইতে বড় বড় দু'ফোঁটা জল পড়িল।

চারুবাবু যথাসাধ্য অতিথিকে যত্ন-শ্রদ্ধা করিতেছেন, মনের সাধে অতিথি সেবা করিতে পারিতেছেন, এইজন্য তাঁহার আনন্দের সীমা নাই, কিন্তু পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা মাঝে মাঝে বলে—"একি চিরদিনের অতিথি নাকি ? এত দিন হয়ে গেল, যাবার ত নাম গন্ধটীও করে না।"

চারুবাবু তাহাদের ধমকাইতেন, বলিতেন —"তোরা অমন করিস্‌নে,আমার কত সৌভাগ্য যে অতিথি ঠাকুর দয়া করে এই ১৪।১৫টা দিন মাত্র রয়েছেন। তোমরা ত জান না ছোক্‌রা, অতিথিসেবা পরম ধর্ম্ম।"

আজ দুপুর বেলা কতকগুলা পাড়ার ছেলে আসিয়া অতিথিকে ধরিল, বলিল—"সন্ন্যাসী ঠাকুর, একটা গল্প বল।"

এমন সময় সেইখানে বিভা আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"সন্ন্যাসী ঠাকুর, আজ আর জ্বর আসে নি, তাই বাবা বল্লেন যা' সন্ন্যাসী ঠাকুরকে প্রণাম করে আয়।"

বিভাকে দেখিয়া সন্ন্যাসীঠাকুর যেন হাতে স্বর্গ পাইল, আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে নিকটে বসাইল।

ছেলেদের সঙ্গে বিভাও গল্প বলিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীঠাকুর তারপর একটী গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে অতিথিদেব বিনীতভাবে চারুবাবুর নিকট বিদায় চাহিয়া বলিলেন—"মহাশয়, আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া এতদিন আমি পরম সুখে কাটাইয়াছি, আর এখানে থাকিব না, এবার আমায় বিদায় করুন। আপনার কাছে আমার একটী ভিক্ষা আছে—পূর্ণ করিবেন কি ?"

চারুবাবু সাগ্রহে বলিলেন—"কি আজ্ঞা বলুন, অতিথির আজ্ঞা আমি প্রাণ থাকতে অমান্য ক'রব না। কি চান বলুন দেব ! আমার এমন কি ধন আছে যা' দিয়ে অতিথিকে সন্তুষ্ট করতে পারব।

তখন বাহিরের দরজার নিকট দাঁড়াইয়া একটী ভিখারী করতাল বাজাইয়া গাহিতেছিল।—

"কি ভিক্ষা দিবে রাজমহিষী,
আমি অভিলাষী,—
তোমার ঐ উমাশশী।"

হৃদয়াবেগে বলিয়া ফেলিল—"আমি আপনার স্নেহের কুসুম বিভার পাণীপ্রার্থী।" তাহার নেত্র-পল্লব আর্দ্র হইয়া আসিল।

চারুবাবু ত অবাক্।

প্রায় পঁচিশ মিনিট কাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে চারুবাবু বলিলেন—"আচ্ছা, তাই হবে, দেব ব'লে যখন অতিথির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন দেব-ই।"

সেখানে পাড়ার দুইজন ছেলে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা হো হো করিয়া হাততালি দিয়া উঠিল, একজন দৌড়িয়া অন্দরে গিয়া গৃহিণীকে খবর দিল।

গৃহিণী "ওমা কি সর্ব্বনাশ" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী মিত্র—সরস্বতী।

শরতে মাতৃমূর্ত্তি।

অপগত মেঘ-বরষা
গত বরষা ভরসা
শ্যাম ধরণী সরসা,
কাশ কুসুম বিকাশে;
শরতে শারদাকাশ
সুনীল সুশুভ্র হাস
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ রাশ
যেন শঙ্কিত সত্রাসে।
কল কল তটিনী জল
তর তর তরঙ্গ দল
হাসে নাচে অবিরল
মধুর প্রেম উল্লাসে;
শোভে শ্যাম কিশলয়
সাজায়ে কুসুম চয়,
ফুল্ল কুঞ্জবন হৃদয়
প্রভাত হিল্লোলে হাসে।
প্রভাতে পাখী আকুলি'
গায় গীত মধু বুলি,
প্রতিধ্বনি গায় ভুলি'
কেন? কি মোহ আবেশে?
শ্যামা বঙ্গে মাতৃপূজা
শ্যামা মা দশভূজা,
এইতে সন্তানের পূজা
হের গো আবার আসে,—
প্লাবন প্লাবিত বঙ্গে
আসে মাতা নানা ভঙ্গে
করে কত লীলা রঙ্গে
তরঙ্গ নাচে হরষে;
দশ দিক দশ হস্ত
দশায়ুধ তাহে ধৃত
বিতরে বরাভয় কত
নাশিতে সন্তান ত্রাসে।
সাগরোত্থিতে শ্যামা মা
সদ্য-স্নান-সিক্ত-বসনা,
হিমাদ্রি অঙ্কে আসীনা
পদ চুম্বে সিন্ধু হরষে;
কমল বিমল জলে
হাসে ভাসে কুতূহলে
বেষ্টিতে চরণ মৃণালে
যত্নে সতত প্রয়াসে।

ঘন কাদম্বিনী কেশে
সদা সৌদামিনী হাসে
বিশ্বজগত সকাশে
মাতৃ-রূপ-জ্যোতিঃ বিকাশে —
শ্যাম সুন্দর বনাঞ্চল
স্বর্ণ জ্যোতি ফুলদল
হৃদে মধু পরিমল
দুলিছে অনিল শ্বাসে ;
পদে নত সিংহ শার্দ্দুল
সর্ব্বপ্রভাব অতুল,
সন্তানে দেখতে কূল
সিংহ-বিমর্দ্দিনী বেশে।
দক্ষিণে রমা ধনেশ্বরী,
গণেশ সর্ব্বসিদ্ধিকারী,
বামে মা বচনেশ্বরী,
কার্ত্তিক বীরেন্দ্র বেশে ;
বাণী বীণা স্বর্ণকরে
গায় গীত মধুস্বরে,
কত কবি মোহঘোরে
মজিয়া ছিল আবেশে,—
বাল্মিকী, ব্যাস, কালিদাস,
জয়দেব, কীর্ত্তিবাস,
রামপ্রসাদ, চণ্ডীদাস,
ভারত, ঈশ, কাশীদাসে ;
মধুসুদন, নবীন,
হেম, দীনবন্ধু, বঙ্কিম,
দ্বীজেন্দ্র, গিরিশদীন,
রজনী,রাজকৃষ্ণ মিশে ;
চাঁদ, কেদার প্রধান,
রণজিৎ, সীতারাম,
পৃথ্বি, রাজসিংহ,মহান্
গণেশ, উদয় পাশে ;
দুর্গাবেশে এ ধরণী
আসিযে মা শিবরাণী,
দে মা চরণ দুখানি
অধীন অধম দাসে।

শ্রীমিহিরজ্যোতি দাস।

পণ্ডিত

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শফরি অল্প জলেই আপনার প্রভুত্ব দেখাইতে চায় কারণ গভীর জলে যাইবার তাহার ক্ষমতা নাই—যাইতেও পারে না। কিন্তু বড় বড় রোহিত মৎস্য আপনার ভাবে বিভোর হইয়া অগাধ গভীর জলে ধীর স্থির ও প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করিয়া নীরবে আপনার কার্য্য সাধন করে—ইহাই হইল শফরী ও রোহিতের প্রভেদ কিন্তু মৎস্য উভয়েই। আজকাল আমাদের দেশে সাহিত্য-সেবীর অভাব নাই। যে কোন প্রকারে হউক, বিদ্যাবলে বলীয়ান হউন আর নাই হউন, যথা তথা হইতে তাঁহারা কতকগুলি আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া, কোন ভাব নাই—ভাষার কোন পারিপাট্য নাই ; বিদ্যার প্রভাব ও জ্ঞান যৎসামান্য লইয়া কেবল সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় অজস্র অর্থ-ব্যয়ে বিজ্ঞাপন দিয়া নিজের নাম প্রচার করিতেছেন ; নিজের মহিমার ঢাক নিজে বাজাইয়া বাজার সর গরম করিতেছেন। প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ নাই ; বহুদর্শিতা জ্ঞান বা হিন্দুর মৌলিক শাস্ত্র-জ্ঞান আদৌ নাই ; কেবল আত্ম-

স্ফুরিতা ও অহঙ্কার লইয়া সাহিত্যসমাজে আপন মাথা তুলিয়া আছেন। সে মস্তক আর নমিত হইবার নহে। নম্রতাই যে জ্ঞান-লাভের চরম লক্ষ্য, তাহা তাঁহারা ভাবেন না; মনে করেন ইহাই বুঝি খুব বাহাদুরী—এরূপ করিলেই বুঝি প্রধান সাহিত্যিক হওয়া যায়। আজকাল ছোট আর কেহই নাই,সকলেই বড়—সকলেই প্রসিদ্ধ—অপ্রসিদ্ধ কই কাহাকেও ত দেখিতে পাই না। কিন্তু যাঁহারা রোহিত মৎস্যের ন্যায় অগাধ জলে বিচরণ করেন, জ্ঞানের গভীরতায় যাঁহাদের হৃদয়-গহ্বর পরিপূর্ণ, অগাধ পাণ্ডিত্যে যাঁহাদের অধিকার জন্মিয়াছে, তাঁহারা সামান্য লোকের মত নিজের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য ঢক্কা নিনাদ করেন না। নীরবে আপন হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি-প্রাবল্যে বাণীর চরণ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া নিজে ধন্য হন—জগতকে ধন্য করেন, ইহাই মহতের কার্য্য।

আজ আমরা যে মহাত্মার গুণ-কীর্ত্তন করিতেছি—ইনি সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত; সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় মহাপণ্ডিত—তাঁহার ন্যায় নির্ভুল লালিত্যপূর্ণ ভাষায় পুস্তকাদি লিখিতে অধুনা আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে তিনি ঢাক বাজান না বলিয়া বা বাহ্যিক কোন আড়ম্বর নাই বলিয়া বাজারে তাঁহার নামের প্রাবল্য তত নাই। কিন্তু যাহারা যথার্থ সাহিত্য-সেবী, বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানবলে সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করেন—পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর তাঁহাদের সকলের নিকটই সুপরিচিত। যজ্ঞেশ্বর বাবু নীরবে আজীবন সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। নীরবে মাতৃ-ভাষার অনেক পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন—কত যে দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক-তত্ত্ব, প্রত্ন-তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া বঙ্গবাণীর চরণ-সজ্জা করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা তাঁহাকে জানেন বা তাঁহার পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছেন,তাহারাই বুঝিতে পারিবেন। পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর অসংখ্য পুস্তকের রচয়িতা ও অনুবাদক। প্রথমে বরাট প্রেস হইতে তিনি অনেক শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রাঞ্জল অনুবাদ বাহির করিয়া শাস্ত্র-পাঠী পাঠকের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক টেড্ সাহেবের রাজস্থানের অনুবাদ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই রাজস্থানই আজকাল বাঙ্গালার অধিকাংশ লেখকগণের ঐতিহাসিক গল্প বা উপন্যাস রচনার উপকরণ স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতীত ও বর্ত্তমান কালের কত মাসিকের সম্পাদকতা করিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রে যে কত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অনেকানেক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও তিনি অনুবাদক। সময় সময় নিজে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া অনেক পুস্তকাদি রচনা করতঃ প্রকাশকেরই নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের একমাত্র উৎসাহদাতা, দীনবীর মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি,এস, আই বাহাদুরের সাহায্যে বঙ্গবাণীর এক অভিনব অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছেন। জগতের "সভ্যতার ইতিহাস" প্রচার করিয়া মায়ের চরণ পূজার আয়োজন করিতেছেন। এ গ্রন্থ শেষ হইলে বাস্তবিক যজ্ঞেশ্বরবাবু বঙ্গসাহিত্য-গগনে ধ্রুবতারারূপে

চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিয়া মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের আলোক রশ্মি সমুদ্ভাসিত করিবেন।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, কীর্ত্তিচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ সাহিত্য-সেবীর অভাব অভিযোগে মুক্তহস্ত হইয়া তাহাদিগকে নির্ভাবনায় সাহিত্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—তাই ভারতচন্দ্র,রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির ন্যায় সাহিত্য-সাধক এদেশে অমর-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আজকাল বঙ্গের সমুজ্জ্বল গগণে অনেক চন্দ্রই বর্ত্তমান, কিন্তু বাঙ্গালার সাহিত্য-গগণ যে কেবল মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রই সমস্ক্ত করিয়া রাখিয়াছেন,তাহা কে অস্বীকার করিবে। এ ক্ষেত্রে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কর-বিতরণ না করিলে বোধ হয় যজ্ঞেশ্বরের ন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের এ কার্য্যে সফলতা লাভ হইত কি না সন্দেহ।

আজকাল আমরা যাহাদিগকে সাহিত্যরথী বলিয়া পূজা করি, পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর তাহাদিগেরই মধ্যে অন্যতম। তিনি যতই নাম চাপিয়া রাখিয়া নীরবে অবস্থান করুন না কেন, কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম প্রচার হইবেই হইবে। সেদিন কলিকাতার ছবির মাসিক পত্র "ভারতবর্ষে" অনেক প্রসিদ্ধ, অপ্রসিদ্ধ, গণ্য, নগণ্য সাহিত্যিকের প্রতিকৃতি প্রকাশ হইয়াছিল—কিন্তু তাহাতে যজ্ঞেশ্বর বাবুর ন্যায় প্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিকের প্রতিকৃতি বা পরিচয় না দেখিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়া তাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশ করিব বলিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে কুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিলেন—বৎস! আমি তাহাতে আদৌ সম্মত নহি। আমার অগ্রজ স্থানীয় চন্দ্রশেখর বাবুরও ত কই অদ্যাবধি কোন স্থানে প্রতিকৃতি প্রকাশিত হয় নাই। তবে কি তিনি পতিত হইয়াছেন। এরূপভাবে সমাজে নিজেকে প্রচার করিতে আমি আদৌ ইচ্ছুক নহি। তাঁহার অনিচ্ছা-সত্বে আজ আমরা কর্ত্তব্য বোধে ইহা প্রকাশ করিলাম। জানি না—ইহাতে তিনি তুষ্ট কি রুষ্ট হইবেন। তবে ব্রাহ্মণের নাকি ক্ষমাই একমাত্র ভূষণ—এইজন্য আমরা এ কার্য্য করিতে সাহস করিয়াছি। ভগবান যজ্ঞেশ্বর বাবুকে দীর্ঘজীবি করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি বিধান করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। সম্পাদক।

প্রেমের জয়।

সহস্র বীরের প্রাণ-বিনিময়ে
রাজত্ব লভে গো নরে।
কপালের ঘাম পায়ে ফেলি লোকে
রতন সঞ্চয় করে॥
কত লালায়িত মানবের মন
প্রভুত্ব লাভের তরে।
কত সাধনায় সাধক প্রধান
অজ্ঞতা তমস হরে॥
কিন্তু প্রেমের পরশ মাণিকে
সর্ব্বার্থ সাধিত হয়।
মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা বহে প্রেমে
গাও গো প্রেমের জয়॥
প্রেমের প্রভাবে পাষাণ পরাণে
অমিয়ের ধারা ঝরে।
প্রেমের সঞ্চারে দস্যু রত্নাকর
রামায়ণ গান করে॥
প্রেমের আবেশে পাগল হাফেজ
নয়নে বহায় নীর।

প্রেম-স্বরূপিণী গীতি-কবিতায়
অমর সেক্‌সপীর ॥
প্রেম হৃদে যাঁর অমর সে সদা
নাই তার মৃত্যুভয়।
বিরস-বিটপী মুকুলিত প্রেমে
গাও গো প্রেমের জয় ॥
দরিদ্র আঁধারে দান্তে করিব
প্রেম দিয়েছিল আলো।
মিল্টনের প্রেম-প্রাণোন্মাদী গান
ঘুচায় মনের কালো ॥
প্রেমের জ্যোতিতে কালোরূপে কালা
জগৎ উজল করে।
প্রেমের প্রভাব জরা, জ্বালা, দুঃখ,
রোগ, শোক, তাপ হরে ॥
মরতে আনিতে স্বরগের ধারা
প্রেমই পারগ হয়।
মানবের চিত্ত দেবত্বে ভরে সে
গাও গো প্রেমের জয় ॥

মোহাম্মাদ আবদুল সাত্তার।

দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ

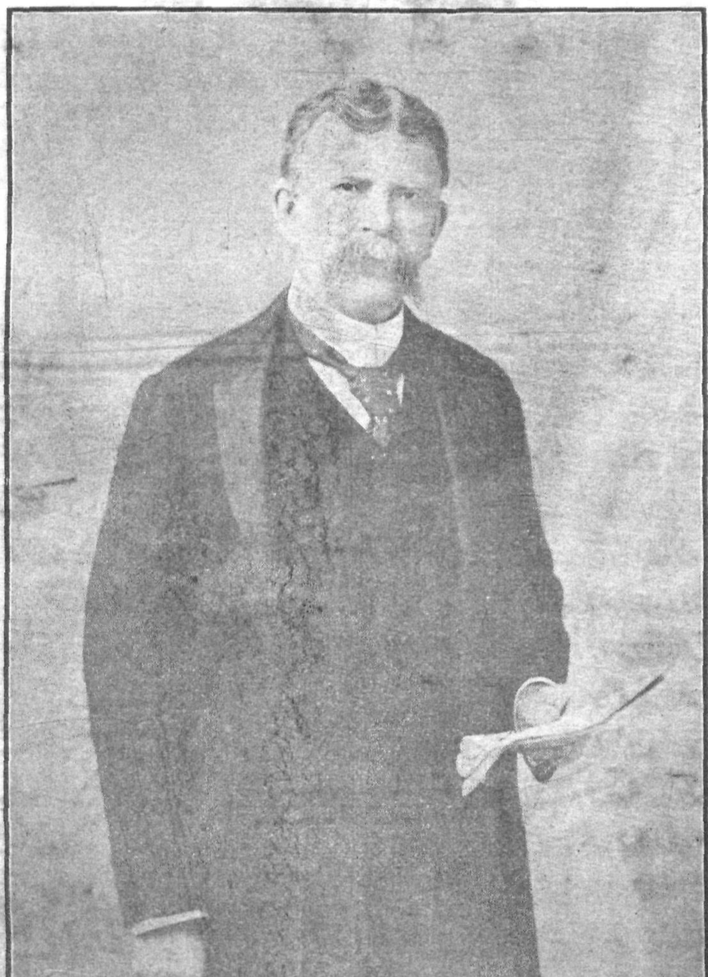
নিবেদন।

বঙ্গবাসী ভাইবোন,

পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ ও বন্যার দুঃসংবাদ অনেক দিন হইতেই আপনারা শুনিতেছেন। প্লাবন যখন ভীষণ আকার ধারণ করিল, তখন হইতে ব্রাহ্মসমাজ দুঃস্থ স্বদেশবাসীর সেবাকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের ৯ জন কর্ম্মী নিম্নলিখিত স্থান সমূহে কেন্দ্র করিয়া অনশনক্লিষ্ট নরনারীকে সাহায্য বিতরণ করিতেছেনঃ— সরাইল, কালীকচ্ছ, সাবাজপুর, রাণীদিয়া, বিত্থাকুট, মগরা, জয়দেবনগর, শিবনগর, কুটী। প্রত্যেক কেন্দ্রে ১০০০ লোকের উপর সাহায্য পাইতেছে; কোন কোন কেন্দ্রে সাহায্যপ্রাপ্ত লোকদিগের সংখ্যা ৩০০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বিপন্ন গ্রামবাসীগণ নানা স্থান হইতে নূতন সাহায্যকেন্দ্র খুলিবার জন্য আমাদিগের নিকট কাতর প্রার্থনাপত্র প্রেরণ করিতেছেন। আমরা আরও সেবক পাঠাইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এখনই সাপ্তাহিক ব্যয় ১২০০ শত টাকা হইয়াছে, এবং কেন্দ্রসংখ্যা বৃদ্ধি না করিলেও পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা শীঘ্রই এত বাড়িবে যে সপ্তাহে ২০০০ টাকার কমে কুলাইবে না। বিপন্ন স্বদেশবাসীর প্রতিনিধিরূপে এই আবেদন লইয়া আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হইতেছি। আপনাদের সহানুভূতি ও আনুকূল্য পাইলে আমাদের উৎসাহ ও কার্য্যক্ষমতা শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে। ক্ষুধিতকে অন্নদান আপনারা চিরদিনই করিয়া আসিতেছেন। এই সঙ্কটকালে কি আর্ত্তনরনারীর প্রতি আপনারা বিমুখ হইবেন?

বিনীত নিবেদক
শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী
শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র
শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র
শ্রীনীলরতন সরকার
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য

সাহায্যার্থ দান ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক— শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের নামে কলিকাতা, ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে, পাঠাইতে হইবে।



সার হেনরি কটন, কে, সি, এস্, আই।

BENGAL LIBRARY
DEC 9 - 1915
WRITERS' BUILDINGS.

বিজয়া-সম্ভাষণ।

দুর্গোৎসবের পরই বিজয়োৎব—এ উৎসব আর কোনও পূজায় নাই—ইহা কেবল দুর্গোৎসবের জন্যই বিধিনির্দ্ধারিত। দুর্গাপূজা করিয়া ভগবান রামচন্দ্র রক্ষ-সমরে জয়লাভ করিয়া এই বিজয়োৎসব করিয়াছিলেন। বানর কটক লইয়া আত্মীয়স্বজনবর্গের সহিত আনন্দোমত্ত হৃদয়ে কোলাকুলি, নমস্কার, প্রণাম, অভিবাদন প্রভৃতি যোগ্যতানুসারে বিনয় সম্ভাষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ত্রেতার সেই পবিত্র স্মৃতি এখন মর্ত্তবাসী কায়মনে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। আজ আমাদের সেই শুভদিন—তাই গ্রাহক অনুগ্রাহক, পাঠক, পৃষ্টপোষকবর্গকে আমরা যথাযোগ্য সাদর-সম্ভাষণ করিতেছি। মহামায়ার কৃপায় যেন আমরা সর্ব্বকার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে পারি, মঙ্গলময়ীর কৃপায় আমাদের জীবনের গণা দিনগুলি যেন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায়, আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মে যেন কোন বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত না হয়; বিশ্বজননীর পাদপদ্মে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

কেন ?

সাজানো বাগান মোর করিয়া শ্মশান
সে গিয়াছে চলি ;
দারুণ চিতার তাপে শুকায় পরাণ,
ঝরে ফুল কলি।
মৃত্যু-রূপী বিরহের জিহ্বা লেলিহান
শুষিছে হৃদয়,
হাসি অশ্রু সাধ আশা মান অভিমান
দহে প্রাণময়।

(২)

কেন এ জলন্ত জ্বালা ? না হয় নির্ব্বাণ
চিত-চুল্লী মম ?
ইন্দ্রিয়ের কোলাহল কেন অবিরাম
প্রেত-ধ্বনি সম ?—
থামো বহ্নি বাসনার, ঝর শান্তি-নীর
বিন্দু বিন্দু বুকে ;
কাম-গন্ধ নাহি আর, প্রেম অশরীর
চুম্বিল কি সুখে ?

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

"ফিরে এস।"

দরশন আশে রয়েছি বসিয়া,
ফিরে এস ওগো ফিরে এস ;
আঁধার হৃদয় আলোকিত করি,
ওহে আকাঙ্খিত ! ফিরে এস।
এ ধরার যাহা, অত্যন্ত সুন্দর
তোমা বিনে তারা, নহে মনোহর ;
তাই মোরা কাঁদি, রয়েছ কোথায়
ফিরে এস ওগো ফিরে এস ॥

(২)

মোদের অতৃপ্ত বহু-দিন আশা
হেরিব তোমায় ফিরে এস ;
বহুদিন পরে, সে সাধ মিটাতে
(সখা !) বারেকের তরে ফিরে এস।
সম্পদে থাকা, তোমারি বিহনে,
চির নির্ব্বাসন সম, জাগে মনে ;
তাই ডাকি মোরা হে চির সুহৃদ,
সুন্দর মধুর ! ফিরে এস ॥

(৩)

হে চির সুন্দর মন-মুগ্ধ-কর
প্রিয়তম ! তুমি ফিরে এস ;
হারান গরব সুখ শান্তি সব
ফিরে দিতে তুমি ফিরে এস।
দয়াবান তুমি সকলেতে জানে,
কাঁদাওনা আর অনুগত জনে ;
কৃপণ হয়োনা দেখা দিতে দীনে
প্রিয়তম তুমি ফিরে এস ॥

গঙ্গাধর।

কালরাত্রি।

"শুনেছিস্ মণি? তোর যে ক্যাবলার সঙ্গে বিয়ের সব ঠিক ঠাক্ হয়ে গেল।"

"দেখ ভাই, রোজ রোজ এককথা নিয়ে ঠাট্টা ভাল লাগে না। তোরা যেন একটা হুজুক পেয়েছিস্, না?"

"হুজুক কি লো? সত্যি সত্যি এইমাত্র মাসীমা আমায় বল্লেন।"

"বলে থাকে বলেছে। তা আমাকে শোনাতে এসেছিস্ কেন?"

"তুই অত রাগ করিস্ কেন মণি? আচ্ছা ঠিক বল দেখি, আমাদের ক্যাবলাকে কি তোর পছন্দ হয় না? কেন, সেত দিব্বি ছেলে। তার উপর কত লেখাপড়া শিখেছে। কত—

মণিমালা শেফালির মুখ হইতে কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"আমি ত ভাই তোকে ঘট্‌কালি করতে বলিনি। বাবা মা যার সঙ্গে বিয়ে দেবে তার সঙ্গেই হবে, তোর আমার কথা নিয়ে ত আর কাজ হবে না।" রাগে, অপমানে মণিমালার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল।

মণিমালা সম্পর্কে শেফালিকার ভগিনী হইত। দুজনে বড় ভাব, দুজনে বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে লালিত পালিত, এক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত, একসঙ্গে খাওয়া, দাওয়া, শোওয়া, বসা—কাজেই দুজনের মধ্যে একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। ক্যাবলরাম তাহাদের প্রতিবেশী কোনও এক ভদ্র গৃহস্থের সন্তান। সে বাল্যকাল হইতেই একটু চঞ্চল স্বভাব। ছুটাছুটি, মারামারি এই লইয়াই তাহার মধুর শৈশব নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইয়াছিল। ছেলেটি দেখিতে সুন্দর, ফুটফুটে। সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়। এত অত্যাচার সত্ত্বেও গ্রামের লোক সকলেই ক্যাবলরামকে ভাল বাসিত। প্রতিবেশী, আত্মীয়, স্বজন, পিতা-মাতার অত্যধিক আদরে সে বাধ্যতার সীমা অনায়াসেই অতিক্রম করিয়াছিল। তাহার খেলার সাথী, বিদ্যালয়ের সহপাঠী এমন কেহ ছিল না, যাহারা তাহাকে ভাল না বাসিত। কেবল এই ক্ষুদ্র বালিকা মণিমালা ক্যাবলরামকে ভালবাসিত না। সর্ব্বজয়ী ক্যাবলরাম অনেক চেষ্টা, অনেক যত্ন, অনেক কৌশল করিয়াও এই ক্ষুদ্র হৃদয়টীকে জয় করিতে পারে নাই। বাল্যকাল হইতেই কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা, অহেতুকী উপেক্ষা, মণিমালার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সকলের ভালবাসার মধ্যে এই বালিকার নীরব উপেক্ষা ক্যাবলরামের সমস্ত আমোদ-আহ্লাদ, সমস্ত সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া দিত। সে ভাবিয়া পাইত না, কেন এমন হয়। বুদ্ধিমান বালক সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে, যেমন সে বুঝিতে পারে না কেন এমন হইল, ক্যাবলরামও সকলের আদর-স্নেহের মধ্যে এই বালিকার তীব্র উপেক্ষার কারণ কিছুতেই নিরাকরণ করিতে পারিত না।

মণিমালার প্রায় ১৩।১৪ বৎসর বয়স হইয়াছে। বসন্তের নব-পল্লবিত লতার মত তাহার দেহে যৌবনের চিহ্নগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বয়স্থা কন্যা, কাজেই পিতামাতা তাহার বিবাহের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজকালকার বাজারে সুপাত্র লাভ যে কত কষ্টকর, তাহা বোধ

হয় ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। সুপাত্রে কন্যা-দান কেবল যে কন্যার রূপ গুণের উপর নির্ভর করে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর রজতকাঞ্চনের ষোড়শোপচারে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ না করিলে, বরপক্ষীয় আত্মীয় কুটুম্বের এমন কি বাটীর সরকারটীর পর্য্যন্ত পায়ে হাতে না ধরিলে, ভিক্ষুকের মত দ্বারে দ্বারে তাড়নার আঘাত না পাইলে কন্যাদান রূপ মহাপুণ্য লাভ হয় না। আফিসের কেরাণী যেমন বড় সাহেবের "ড্যাম" "ফুল" রূপ গুরুপাক দ্রব্য অনায়াসে উদরস্থ করিয়াও তাঁহাকে মধুর সম্ভাষণে সম্মানিত করেন, আজকালকার "কনের বাবা" যাহারা, তাঁহা-দিগকেও বরপক্ষীয় সকলের পৈশাচিক অত্যাচার এবং তীব্র বিদ্রূপ বাণ অবাধে সহ্য করিয়া তবে কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। বর-পক্ষীয় মহাত্মাগণ যেন ষ্টেশন মাষ্টার আর ভাগ্যহীন কন্যার পিতারা যেন টিকেট হীন পথিক। মণি-মালার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিতেছিলেন না। দু-একটী পাত্র জুটিয়াছিল, লেন, দেন, পাওনাগণ্ডা এক রকম মিটমাটও হইয়াছিল, কিন্তু মণিমালার মাতা লক্ষ্মীদেবীর তাহাতে আদৌ মত ছিল না। সবেমাত্র একটী কন্যা,—সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও যাহাতে সুপাত্রে অর্পিত হয়, এই ইচ্ছাই তাঁহার বলবতী হইয়াছিল।

গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করিয়া ক্যাবলরাম কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য কলিকাতায় আসিল। মাঝে মাঝে সে অবসর মত দেশে আসিত, মণি-মালা তাহাকে এখনও সেইরূপ ঘৃণা করে কিনা জানিবার জন্য সে দেশে আসিলেই সর্ব্বাগে তাহাদের বাটী যাইত, কিন্তু মণিমালার দেখা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না, ক্যাবলরাম দেশে থাকিলে বাটীর বাহির হওয়া দূরে থাক, মণিমালা কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহিত না।

শেফালি বলিল—"হ্যাঁ ভাই মণি, ক্যাবলা এত করে তোর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছট্‌ফট্ করে, তোর কি একটুও মমতা হয় না? না হয় তাকে দেখতেই না পারিস্ তবু গ্রাম-সম্পর্কে সে ত তোর বড় ভাই, কত আহ্লাদ করে মণি কোথা জেঠাই মা, মণি কোথা জেঠাইমা, বলে তোদের বাড়ী ছুটে আসে, তুই এমনি ছোটলোক যে একবার তার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে চাস্ না। বেচারী যেমনি হাসি মুখে আসে, তেমনি মুখখানি চূণ করে আবার ফিরে যায়।"

"তোকে বার বার বলেছি শেফালি, যে ক্যাবলা দাদার কথা নিয়ে আমার সঙ্গে তামাসা করিসনি, কিন্তু তোর ওই কথা ছাড়া আর কথা নাই।"

একি তোর গোঁ ভাই? সে বেচারা কি দোষ করেছে যে তুই একটা কচি মেয়ে, তাকে এমন করে অপমান করিস্? পাড়ায় এমন কেউ নাই যে তাকে ভালবাসে না, আর সেত বদ্ ছেলে নয়, অমন ছেলে আমাদের গাঁয়ে আর একটীও আছে কি? আমাদের সে কত ভাল বাসে। যেমন সে ছেলেবেলায় দুষ্ট ছিল, এখন তেমনি লক্ষ্মীটী হয়েছে। কারও সাম্‌নে মাথাটী তুলে কথা পর্য্যন্ত কয় না। কল্‌কাতা থেকে দেশে এলে সে সকলের সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ না করে থাকতে পারে না। অমন যে বিদ্বান, তা একটু গরব নাই, একটু অহঙ্কার নাই। কাল

আমাদের বাড়ী এসে কতক্ষণ বসে রইল। আমাদের কত গল্প বল্লে। কলকাতার কথা, গড়ের মাটের কথা, চিড়িয়াখানার কথা, আরও কত কথা। সকলে তাকে এত ভালবাসে, কিন্তু তোর ভাই এ এক বিদ্‌কুটে ঝোঁক। ক্যাবলাকে দেখলেই তোকে যেন ভূতে পায়। আমার মাথার দিব্বি, আজ তোকে বলতেই হবে, কেন তুই তার উপর এত চটা? হাঁ, কালই সে বলছিল "তোর বিয়ের কিছু ঠিক হয়েছে কিনা।" যদি না হয়ে থাকে, ত তাদের সঙ্গে নাকি রমেশ বলে একটা ছেলে পড়ে, বড় শান্ত শিষ্ট, তবে ভাই গরীব লোক। ক্যাবলা চেষ্টা করে তার সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দিতে পারে। যাক— এখন তুই বল দেখি তার উপর তোর এত রাগ কেন?" মণিমালাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া শেফালি পুনরায় বলিল—"বলবি না? আচ্ছা, আমাকে বলতে তোর লজ্জা করে বুঝি? মণি! আমি এই কথা নিয়ে আগে তোর সঙ্গে তামাসা করতাম বটে, কিন্তু এখন দেখছি আমি তামাসা করে ভাল করিনি। কেন তোর এমন হয়? তোর চেয়ে আমি বয়সে বড়, তোর চেয়ে আমি অনেক বেশী বুঝি, আর তা' ছাড়া এক সোয়ামী ব্যতীত বোধ হয় আর কা'কেও আমি তোর মত ভালবাসি না। দুজনে এক সঙ্গে দিনরাত আছি, তোর কথা ভাবলে আমার সত্যিই বড় কষ্ট হয়। তোর হাতে ধরে বলছি, লক্ষ্মীটি. বল—কেন তোর এমন হয়? ক্যাবলার কোনও কথা উঠলে তোর মুখখানা ফ্যাকাশে মেরে যায় কেন? তোর মনের ভেতর সমস্ত গোলমাল হয়ে যায় কেন? একটু আগে তুই যে হাসি হেসেছিস্, যেমন করে প্রাণ খুলে কথা কয়েছিস্. সে সমস্ত দূরে চলে গিয়ে তুই পাগলের মত হয়ে যাস কেন? দেখ, তোর কষ্ট দেখলে আমার প্রাণটা কর্ কর্ করে ওঠে। আমায় খুলে বল, যদি এর কোনও প্রতীকার হয় ত আমি জীবন দিয়েও করব।"

মণিমালা ইত্যবসরে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল—"বিশ্বাস করবি কি না জানি না। তবে আমি সত্যি কথা বলছি, কেন যে এমন হয় তা আমি নিজেই জানি না ভাই। আজ বলে ত নয়, ছেলেবেলা থেকেই আমায় এই রোগে ধরেছে। এখন আমার জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে আর ছেলে মানুষটি নই, বুঝি যে এমন ব্যবহারটা কারও পছন্দ-সই নয়। জানি যে এমন করে, পাড়া প্রতিবেশী, ভাই বোন এদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করা কোনও মতেই উচিত নয়। তবু কি জানি কেন এমন হয়! তোরা সকলে যা'ই বল না কেন, আমার যেন মনে হয় ও আমার কত দিনের শত্রু।"

"ছি! অমন সব ছাই কথা কি মনে আন্‌তে আছে? মিছামিছি মনের মধ্যে একটা ঝড় ঝাপটা তুলে ফল কি বল দেখি? এখনও তোর ছেলে মানুষী গেল না?

"ভাই! মনকে অনেক বুঝিয়েছি। অনেক ভেবেছি, কিন্তু মন কিছুতেই বাগমান্‌তে চায়না। কেমন ছেলেবেলা থেকে—কেমন যে একটা স্বভাব হয়ে গেছে, তা কোন মতেই বদ্‌লাতে পারছি না।"

আচ্ছা, আর একটা কথা! ভগবান্ না করুন—যদি ক্যাবলার সঙ্গেই তোর বিয়ে হয় তখন—

এ রকম একটা অঘটন ঘটিতে পারে, একথা মণিমালা জীবনে কখনও ভাবে নাই, হঠাৎ এই কথা শুনিয়া তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। শেফালির এই সাংঘাতিক ভবিষ্যদ্বাণীতে মণিমালার প্রাণ একটা স্তব্ধ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। প্রবাসস্থিত উপযুক্ত সন্তানের অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া—স্নেহময়ী মায়ের প্রাণ যেমন কাঁপিয়া উঠে, এই কথা শুনিয়া মণিমালারও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া সেইরূপ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, নাকে, মুখে কপোলে একটা উত্তপ্ত দাহন অনুভূত হইতে লাগিল। সে কথা কহিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। সে উঠিতে যাইয়া ঘরের মেজের উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল।

মণিমালার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না, তখন অগত্যা তিনি একদিন কলিকাতায় ক্যাবলরামের বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইচ্ছা ক্যাবলরামের সহপাঠী রমেশের সঙ্গে যদি কন্যার বিবাহের সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন। ক্যাবলরাম যখন দুঃখের সহিত জানাইল যে রমেশের পিতা অন্য স্থানে বিবাহের সমস্ত ঠিক করিয়াছেন, মণিমালার পিতা তখন প্রমাদ গণিলেন। বলিলেন—"এখন উপায় কি বাবা? মেয়ে ত দেখতে দেখতে পনেরয় পা দিলে, লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হয়ে উঠেছে। কি করা যায়? এমন কি কেউ নাই যে, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জাত-কুল-মান রক্ষা করে? ক্যাবলরাম মণিমালার পিতার এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যথা পাইল। বৃদ্ধের সেই শুষ্ক চোখে সে কখনও জল দেখে নাই, আজ সেই বৃদ্ধকে বালকের মত কাঁদিতে দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইল। একবার মনে করিল বলে যে, একান্তই যদি সৎপাত্র পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাহাকে কন্যাদান করিতে তাহার আপত্তি আছে কি না। পরক্ষণেই ভাবিল—"আমি বিবাহ করিলে মণিমালা কি সুখী হইবে? সে ত বাল্যকাল হইতে আমাকে দেখিলে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লয়, কখনও আমার সহিত ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহে না।" আবার ভাবিল—"মন্দ কি! এই সূত্রে যদি এই বনবিহঙ্গিনীকে নিজের হৃদয় পিঞ্জরে বন্দিনী করিবার অবসর পাই, তাহা করি না কেন! শিক্ষিতা, সদ্বংশজাতা, হিন্দুর ঘরের মেয়ে, বিবাহ হইলে বোধ হয় সে স্বামীর অমনোনীতা হইবে না। এমন ত অনেক পুস্তকে পড়িয়াছি, প্রথম প্রথম স্বামীর সহিত মনের মিল না হইলেও পরে সমস্ত অশান্তি কাটিয়া যায়! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই অবস্থা—ইঁহার এ উপকার করিলে ভগবান আমার প্রতি মুখ তুলে চাইবেন। বাল্যকাল হইতে যে মুখখানি দেখিবার জন্য আমি সুদূর প্রবাসে থাকিয়া সুস্থির হইতে পারি না, যার শত লাঞ্ছনা সর্ব্বাপেক্ষা তুচ্ছ করিয়া যাহাকে দেখিবার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া যাই, তাহাকে লাভ করিবার এমন উত্তম অবসর বৃথায় হারাইব! না, কখনই না। মণিমালার পিতা পুনরায় বলিলেন—"কি উপায় হবে বাবা? এ বিপদ থেকে আমায় রক্ষা করে এমন কি কেউ নাই? বাবা? আমি তোমার পিতার সমান, নিরুপায় হয়ে আজ তোমার কাছে এসেছি, এখন তুমি না রাখলে আমার দ্বিতীয় উপায় নাই।" বৃদ্ধ ক্যাবলরামের দুটি হাত

ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

রান্না ঘরে বসিয়া লক্ষ্মীদেবী রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। আহ্লাদী ঝি যখন গিয়া জানাইল যে,কর্ত্তাবাবু ক্যাবলরামের সহিত দিদি-মনির বিবাহের ঠিক করিয়া আসিয়াছেন, তখন স্বামীর উপর তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন, বলিলেন—"আ, মর! বুড়োর দেখছি বায়াত্তুরে ধরেছে, এই যাচ্চি আমি"—রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্যা হইয়া উনানস্থিত অর্দ্ধসিদ্ধ অন্নের হাঁড়ীতে জলের পরিবর্ত্তে একঘটী দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া রণ-রঙ্গিনী মূর্ত্তিতে স্বামীর প্রতি ধাবমান হইলেন।

মণিমালার পিতা বলিলেন—"দেখ! এতে তোমার অমত করিবার কিছুই নাই। তোমার মেয়ের বড় সৌভাগ্য তাই এমন বর পাওয়া গেছে। আজকালকার বাজারে এক পয়সা না নিয়ে কে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে বলত? এতটা অনুগ্রহ, এতটা ভদ্রতা, এতটা ত্যাগ স্বীকার আর কে করবে বলত? তার উপর ছেলে ত নয় যেন হীরের টুক্‌রো, যেমন রূপ, তেমনি গুণ।

হ্যাঁ গা, বুদ্ধি শুদ্ধি কি একেবারে গেছে? যা'কে দেখলে মেয়েকে আমার ভুতে পায়, যার নাম করলে সে শিউরে ওঠে, তার সঙ্গে বিয়ে দেবে? হ'লই বা সে বিদ্বান, হ'লই বা সে হীরের টুকরো। তার চেয়ে মেয়েটার গলা টিপে মেরে ফ্যাল না, আপদ চুকে যাক?"

"ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও। বিয়ে হয়ে যাক, তারপর দেখে নিও, ঝি-জামাই নিয়ে সুখী হও কিনা। এই ধরণা কেন, তোমার সঙ্গে যখন আমার বিবাহ হয়, তখন কেমন ছিলে? কত চেষ্টা করেও তোমায় দুদিনের জন্যও এখানে নিয়ে আসতে পারিনি যে। এখন ত আর সেদিন নাই। সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে। মন বস্‌লে মণিও আমার সুখী হবে, আর সে তেমন মেয়ে নয়, এই বয়সে তার যা বুদ্ধি আছে, তা বোধ হয় আমাদের নাই।" অনেক তর্কের পর লক্ষ্মীদেবী উপায়ন্তর না দেখিয়া বাধ্য হইয়া চুপ করিলেন।

আজ ফুলশয্যা। কেবলরাম একলা বসিয়া ভাবিতেছিল—"সবই হ'ল, কিন্তু মণির সে বিরাগ কি এখনও যায় নাই। শুভদৃষ্টির সময় যখন সেই সুন্দর মুখখানি নূতন করে দেখ্‌লাম, তখন কত আনন্দই হয়েছিল! সেই অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি, শিশির-স্নাত যুথিকার মত ঢল্‌ঢলে মুখখানি—আহা, কত সুন্দর! আমার ইহজীবনের সাধ এমন সহজে পূর্ণ হবে, তা আমি স্বপনেও ভাবি নাই! কিন্তু মণিকে ত আনন্দিত দেখ্‌লাম না! তাহার আয়ত চক্ষু দুটী কই একবারও ত আমার মুখের দিকে ন্যস্ত হ'ল না! তাহার সেই নিষ্প্রভ উদাস দৃষ্টি দেখে বোধ হল, যেন আমায় বলছে—"নিষ্ঠুর! আমার জীবন-মরণ নিয়ে এ তোমার কি খেলা! আমি তোমার কি করেছিলাম? কেন তুমি আমায় এ ভীষণ পরীক্ষার মাঝে ফেল্‌লে?" বিবাহ করে নববধূ গৃহে আন্‌লাম, সকলে বধূর রূপের ভূয়সী প্রশংসা করলে বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে মণিকে কেহ কথা কহাইতে পারিল না। মণি কি তবে আর কথা কহিবে না! আমার উপর তার আজন্ম-সঞ্চিত ঘৃণা ও বিরক্তি কি তার বাকরোধ করে

দিলে? এত লেখাপড়া শিখলাম, এত লোক-সঙ্গ করলাম—মনে মনে একটা গর্ব্ব ছিল যে আমি লোক-চরিত্র অবগত হ'তে সিদ্ধহস্ত, কিন্তু হায়, এক সামান্য বালিকার কাছে আজ আমায় পরাজয় স্বীকার করতে হল! এত চেষ্টা করেও মণির মনের অবস্থা কিছুই বুঝতে পারলাম না। যা হক, আজ মণিকে জিজ্ঞাসা করব কি করলে সে সুখী হয়, কি করলে তার প্রাণে শান্তি আসে। মণিকে সুখী করতে যদি আমাকে সব ছাড়তে হয়, তাও করব!"

বাহিরের কাজকর্ম্ম শেষ হইলে পর ক্যাবলরাম আস্তে আস্তে ফুলশয্যা-গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল,মণি আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া শুইয়া আছে। ক্যাবলরাম ডাকিল—"মণি" কোনও উত্তর পাইল না। দু-একটী স্ত্রীকণ্ঠের মৃদু হাস্যধ্বনিতে ক্যাবলরামের বড় লজ্জা হইল, সে মণির পার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অবসন্ন ক্যাবলরাম মণিকে কথা কহিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিল, অনেক কাকুতি মিনতি করিল, অনেক কাঁদিল, এমন কি মণির পায়ে ধরিয়া তাহার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল, কিন্তু মণি যেমন শুইয়া-ছিল, তেমনই রহিল, একবারও নড়িল না, একটী কথা পর্য্যন্ত কহিল না। বিরক্ত হইয়া ক্যাবলরাম পাশ ফিরিয়া শুইল এবং অচিরেই নিদ্রার কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিল।

মণিমালা যখন দেখিল যে ক্যাবলরাম সত্য সত্যই নিদ্রিত হইয়াছে, তখন সে ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিল।

সিংহীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া একবার সে তাহার স্বামীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, পরে আস্তে আস্তে দ্বার খুলিয়া একেবারে খিড়কীর দিকে অগ্রসর হইল। পাগলিনীর মত পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, হাত জোড় করিয়া বলিল—"ভগবন! আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি তা আমি জানি না। দয়াময়! বুঝি সব, কিন্তু বুঝে সুঝেও আমার অবাধ্য মনকে কিছুতেই বশে আন্‌তে পার্‌লাম না। আমায় ক্ষমা কর! আমি যে নির্ব্বিঘ্নে মরতে পারছি, সেজন্য তোমায় শত শত ধন্যবাদ। অন্তর্যামি! জানত প্রভু! কি অসহ্য জ্বালায় আমি দিনরাত জ্বলে পুড়ে ক্ষার হয়ে যাচ্চি! পলে পলে মৃত্যু-যাতনা অপেক্ষাও ভীষণ যাতনা সহ্য করচি! ভেবেছিলাম যতদিন বাঁচব, নীরবে নিজের কর্ত্তব্যই করে যাব। কিন্তু তা পারলাম কই দেব! ক্ষুদ্র জ্ঞানহীনা অবলা আমি, আমার কতটুকু শক্তি যে আমি নিয়তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি।" হঠাৎ পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া মণিমালা ভয়াকুলিত-প্রাণে এক লম্ফে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ক্যাবলরামের সংজ্ঞাহীন দেহ পুষ্করিণীর সোপানে সশব্দে পতিত হইল।

শ্রীকুমুদগোপাল ভট্টাচার্য্য।

আমাদের কথা।

দীনতা এবং ধীরতার দিক দিয়া ক্রমশঃ আমাদিগকে জগতের ভাবী সভ্যতাকে গঠন করিতে হইবে। কখন মানবের মনোরথ পূর্ণ

হয়? কখন আশা ফলবতী হয়? যখন চেষ্টার সংগ্রামে মানব নিরস্ত্র হইয়া ভগবানে নির্ভর করে, বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করে, তখনই অভিলষিত বস্তু কুশস্থাসীৎ সবন্ধনে অর্থাৎ আপনা আপনিই ধরা দেয়। চেষ্টা এবং বিশ্বাসকে একত্র করিয়া আমাদিগের জীবন-সংগ্রামে শান্তির জয়ধ্বজা তুলিতে হইবে। চেষ্টাতেই সংগ্রাম, বিশ্বাসেই শাশ্বতী শান্তি। বিশ্বাসই সফলতার মূলমন্ত্র। বিশ্বাস হারাইয়া যাহারা ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে ইহজীবনে কেবল হায়রাণই হইতে হয়। সহস্র চেষ্টায় বিফলতার পর যখন লক্ষ্য বিদ্ধ হয়, তখন সেই সাফল্যকে আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়—মনে হয় এই সামান্য কার্য্যের জন্যও আমাকে এত চেষ্টা করিতে হইয়াছিল!! সফলতা লাভ করিলে তখন জগতের চক্ষে অতি সামান্য বলিয়াই বোধ হয়। আত্ম-চেষ্টার উপর তখন তাহার ধিক্কার আসে এবং একটা দৈব বিশ্বাসে সেই চেষ্টাবাদীর প্রাণ আশস্ত হয়। তাই বলিতেছিলাম, জগতে চেষ্টার অপেক্ষা বিশ্বাসের মাত্রা বাড়াইতে হইবে। বিশ্বাস হারাইয়া চেষ্টা করিলে বোঝা বহা হয় মাত্র—চেষ্টায় তেমন একটা দৃঢ়তা আসে না। জগতের ভাবী সভ্যতা এই সুমহান এবং সুদৃঢ় বিশ্বাসের উপরই স্থাপিত হইবে। সুফলের আশা করিতে হইলে কেবল চেষ্টার বীজ পুতিলেই চলিবে না, বিশ্বাসের উর্ব্বরা ভূমিও চাই। চেষ্টাতে তেজ আছে, কিন্তু তাহাতে কেবল উষ্ণতা জন্মে মাত্র—এই চেষ্টা-তেজকে বিশ্বাসে ঘনীভূত করিতে হইবে। তবেই সেই ঘনীভূত তেজ হইতে আলোক দেখা দিবে। তেজের প্রথম অবস্থা, আমরা উষ্ণতাকেই অনুভব করিয়াছি, তেজের দ্বিতীয়াবস্থা, আলোক দেখিতে পাই নাই। বিশ্বাসে সেই তেজকে ঘনীভূত করিতে হইবে। তখনই সভ্যতার উষ্ণতা এবং আলোক উভয়কেই আমরা প্রাপ্ত হইব। চেষ্টাই সভ্যতার উষ্ণতা, বিশ্বাসই সভ্যতার আলোক। এই চেষ্টা এবং বিশ্বাসকে একত্রিত করিতে হইবে; তেজকে ঘনীভূত করিতে হইবে, তবেই অন্ধকার হইতে আমরা যথার্থ আলোকের দর্শন পাইব। এখনত কেবল আমরা ভবিষ্যৎ-শিশুর ন্যায় অন্ধকারের অন্ধকারে স্বপ্নের আলোক দেখিতেছি; নিশার স্বপ্ন উষার সত্যে পরিণত হয় নাই, তামসী শয্যায় এখনও আমরা শয়ান রহিয়াছি। উষার আলোকে এখনও সত্যের চক্ষুঃ দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই। বর্ত্তমানে আমরা যে জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়াছি, তাহা সেই অতীত যুগের দেবাসুর-সংগ্রামেরই পুনরাভিনয় মাত্র। দেবাসুরের যুদ্ধই আমাদিগের প্রত্যেক জীবনেই অহর্নিশি চলিয়াছে। দৈবী সম্পদ এবং অসুর-সম্পদ লইয়াই আমাদিগের জন্ম, আমাদিগের জীবন-যাত্রা। আমাদিগের রক্তের শ্বেত কণিকায় এবং লোহিত কণিকায় যে অহরহঃ সংগ্রাম, আমাদের স্বভাবেও তেমনি এই দৈবী এবং আসুরিক ক্রিয়ার অবিরাম সংগ্রাম। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত লইয়াই যেমন নাটক ও নাট্যজীবিগণের রঙ্গ-ক্রীড়া, এই জগতের সভ্যতার রঙ্গালয়েও তেমনি এই চেষ্টা এবং বিশ্বাসের সংঘর্ষণ। চেষ্টা এবং বিশ্বাসের সম্মিলন ব্যতীত আমরা-

আর পরিত্রাণ নাই, কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তি নাই। জ্ঞান এবং ভক্তির ঐক্য ব্যতীত জগতে যথার্থ কল্যাণ দেখা দিবে না। ভক্তের আগ্রহ এবং ভগবানের অনুগ্রহ যেখানে মিলিত হয়, সেইখানেই কৈবল্য লাভ হয়। ভক্তিকে জ্ঞানের দ্বারা যাচাই (rectify) করিয়া লইতে হইবে, জ্ঞানকে ভক্তিরসে মধুর করিয়া তুলিতে হইবে। চেষ্টা ও বিশ্বাস, জ্ঞান এবং ভক্তি আগ্রহ ও অনুগ্রহের সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। একেবারে দৈবে বিশ্বাস করিয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। প্রতীচ্যের চেষ্টা এবং প্রাচ্যের নির্ভরতাকে সম্মিলিত করিয়া বিশ্ব-হিতার্থে মানবকে সভ্যতার নূতন পথ দেখাইতে হইবে। এই সহৃদয়তা এবং সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে মানব-সভ্যতার মহা মিলনের সম্ভব, পূর্ব্ব-পশ্চিমের মহা ব্যবধানের উপর সেতু স্থাপনা সম্ভব। তাহা না হইলে কেবল প্রতিযোগিতায়, বিদ্বেষ বুদ্ধিতে ও অসুর স্বভাবের দ্বারা বিশ্ব-মানবের প্রকৃত কল্যাণ সুদূর-পরাহত।

এই নব উদ্বোধনের ভার ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীর উপর পড়িয়াছে। আমরা জাতি ভেদ যতই উঠাইতে চেষ্টা করি না কেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শূদ্র এই গুণচতুষ্টয় প্রত্যেক জীবে আছে, প্রত্যেক জাতিতে আছে, প্রত্যেক স্থানে আছে, প্রত্যেক কালে আছে। তবে কাহাতে বেশী, কাহাতে কম। এই গুণচতুষ্টয়ের তারতম্য লইয়াই সভ্যতার আদান প্রদান। যুগচতুষ্টয়ে এই গুণচতুষ্টয়েরই ক্রম বিকাশ। এই গুণচতুষ্টয়ই জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এখন জগতে এক পাদ মাত্র ব্রাহ্মণত্ব আছে। অবশ্য ব্রাহ্মণত্ব একেবারে যাইতে পারে না— ব্রাহ্মণত্বের পুনরুদ্বোধন অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য তাহার Vestigial structure নিঃশেষ হইতে পারে না। কলির পরেই কল্কি ব্রাহ্মণ-অবতার-রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। ঐকান্তিক অভাব না হইলে ত সৃষ্টির পুনরায়োজন আবশ্যক হয় না।

ভারতবর্ষে এক্ষণে প্রকৃত ব্রাহ্মণের ঐকান্তিক অভাব উপস্থিত। তাই আমার মনে হয়, ভাবী উদ্বোধনের সূচনা এই ভারতবর্ষ হইতেই প্রথম আরম্ভ হইবে। তাহার সাড়া আমরা ইতিমধ্যেই কিঞ্চিৎ পাইয়াছি। বসন্ত আসিবার পূর্ব্বে যেমন কোকিল অগ্রদূত হইয়া আসে, শীতার্ত্ত বৃক্ষের শীর্ষে নব কিশলয়ের সঞ্চার হয়, সূর্য্যোদয়ের অগ্রে যেমন পূর্ব্বাকাশ রক্তিমাভ হইয়া উঠে, ভারতবর্ষেরও তাহাই হইতে আরম্ভ হইয়াছে— ভারতবর্ষের শঙ্খ-ধ্বনি এখন কেবল বিশ্বের কর্ণকেই স্পর্শ করিয়াছে, অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

আমরা সামান্য ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়া সুখের জন্য লালায়িত হই। প্রকৃত সুখ এই দুর্ভিক্ষের দুর্দ্দিনে সুদূর পরাহত।

প্রকৃত সুখ কোথায়? এ কথার উত্তরে আমাদের শাস্ত্র বলিয়াছেন— যে সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্, সর্ব্বং আত্মবশং সুখম।" পাশ্চাত্য কবি-প্রবর ভুক্তভোগী গোল্ডস্মিথ বলিয়াছেন— "Happiness consists not so much in the richness of one's possessions as in the fewness of one's wants." অর্থাৎ— "কতকগুলা ধন সম্পত্তি থাকিলেই প্রকৃত সুখী

হওয়া যায় না, অভাবের অনুভব যাহার যত কমিয়া আসিয়াছে, সেই তদপরিমাণে প্রকৃত সুখী।" এই উদ্ধৃতিদ্বয় দেখিতে বিভিন্ন প্রকৃতির হইলেও প্রকৃত সুখের পথ ইহারা বলিয়া দিতেছে।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখম।" এক্ষণে এই পরবশটা কি? এই পরবশ কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যে মুহূর্ত্ত হইতে আত্মা দেহকে আশ্রয় করিয়াছে, তখন হইতেই আমরা পরবশ হইতে আরম্ভ করিয়াছি। সুখের অন্বেষণে, স্বাধীনতার অন্বেষণে ঘুরিতেছি, পাইতেছি দুঃখ—দুঃখকে সুখ বলিয়া অনুভব করিতেছি, প্রাণে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু দেহ দ্বারা ক্রমশঃই জড়াইয়া পড়িতেছি। জন্ম জন্ম ধরিয়া জীবন ক্রমশঃই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া চলিয়াছে। উর্ণনাভ যেমন আপনার, নাভিজাত ডোর অগ্রসর হইতে হইতে বিস্তার করে, আমারাও তেমনি জীবনের বন্ধন জাল অবিরাম জড়ীভূত করিয়া তুলিতেছি। এ দুঃখ, এ বাসনা, এ আবরণ হইতে নিষ্কৃতি পাইব কবে? কবে আমার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া উলঙ্গ শিশুর ন্যায় অবিকৃত চিত্তে এই বিপুল বিশ্বকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইব, কবে এ ভ্রমণের ভুল ঘুচিবে? উদাসীন উলঙ্গ সাধক সরমাদ বলিয়াছেন—"ভগবান অপরাধীদিগকেই আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, যাহারা নির্দ্দোষ তাহাদিগকে তিনি উলঙ্গ হইবার অনুমতি দিয়াছেন" রামকৃষ্ণ দেব বলিতেন—"লজ্জা মান ভয়, তিনি থাক্‌তে নয়।" এই লজ্জা মান ভয় হইতেই যত আবরণের সৃষ্টি, যত ঢাকিবার ব্যবস্থা, যত আত্মগোপন চেষ্টা। রামকৃষ্ণ লজ্জা মান ভয়কে পরিহার একেবারে করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই উলঙ্গ হইয়া, আবরণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বাণ দেখিতে ছুটিয়াছিলেন। তাঁর কাছে কাপড় পরা আগে নয়, বাণ দেখা আগে। আমাদিগের যোগশাস্ত্র বলেন—"তত ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম।" প্রকাশ রূপ আবরণকে ক্ষয় করিতে হইবে। যেখানে যত প্রকাশ, যত আবরণ, সেখানে তত ব্যবধান, ততই অন্তরের দূরত্ব। নহে কি? অবগুণ্ঠন নারীর লজ্জা মোচনের কারণ হইলেও তাহা সকল সময়ে নারীর সতীত্বের নিদর্শন নহে, তেমনি উত্তম বেশ ভুষা পরিধান সভ্য জাতির লক্ষণ হইলেও পোযাক পরিচ্ছদই কিন্তু মানব-জীবনের যথাসর্ব্বস্ব নহে, আরাম উপভোগই মানবাত্মার শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক নহে। মহাত্মা কর্লাইল সামান্য দুঃখে Sartor Resartus লিখেন নাই, অতি দুঃখেই লিখিয়াছিলেন। ভোগের সভ্যতা, সৌন্দর্য্যের সভ্যতা চিরদিন থাকে না, যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ ও সৌন্দর্য্যের অবসান ঘটে। জোয়ারের পর ভাটার আগমন অবশ্যম্ভাবী। দেহের দিক দিয়া সভ্যতা ও সুখকে অন্বেষণ করিতে গেলে দুঃখই মিলিয়া থাকে, বন্ধনেই জড়িত হইতে হয়। প্রকৃত সভ্যতা ও সুখকে আত্মার দিক দিয়া অন্বেষণ করিতে হইবে। সে সভ্যতা পরিণাম রহিত, সেই সুখই অমৃতের দ্বার স্বরূপ।

ভারতবর্ষ আত্মার দিক দিয়াই সভ্যতা ও সুখকে খুঁজিয়াছিল, ত্যাগের মধ্য দিয়াই আদর্শকে গঠন করিয়াছিল। আমাদিগের দেশে আবরণে জড়িত হইবার প্রয়োজন হয় নাই, জীবনকে জটিল করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ভারতবাসী

অল্পে সন্তুষ্ট ছিল। অভাবের অল্পতা না হইলে প্রকৃত সুখ জন্মে না। অভাব হইতেই দুঃখ ও অন্বেষণের উৎপত্তি। অভাব হইতেই কর্ম্মজাল ঘনীভূত ও বিস্তৃত। জগতকে শান্তিময় করিতে হইলে এই অভাবের নাশ করিতে হইবে,জগতকে সচ্ছল করিতে হইবে। জগতে ধনের অপেক্ষা আহারের সামগ্রী, অভাব মোচনের সামগ্রী বাড়াইতে হইবে। ধন হইতেই যত কৃত্রিমতার ও বিদ্বেষ বুদ্ধির উৎপত্তি। অর্থই যত স্বার্থ ও অনর্থের মূল, ব্যবসা হইতেই শত্রুতার সূত্রপাত! এই যে আজ জগতব্যাপী স্বার্থের সংগ্রাম জাগিয়া উঠিয়াছে, একমাত্র বণিকবৃত্তিই কি ইহার প্রচ্ছন্ন কারণ নহে? বাণিজ্য তরীর পশ্চাতে পশ্চাতে রণতরী লুক্কায়িত থাকে, বৈশ্য বৃত্তির পশ্চাতে পশ্চাতে ক্ষত্রীয় বৃত্তি বল প্রকাশ করে। জগতে যে পরিমাণে ধন রত্ন বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই পরিমাণে শত্রুতা ও বিদ্বেষ-বহ্নিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ মুষ্টিমেয় ধনবানেরা আত্মতৃপ্তির জন্য কোটী কোটী দরিদ্রের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় কোটীপতির অভাব নাই, অথচ তথাকার দরিদ্রগণের দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ধন বৃদ্ধি প্রকৃত সুখের কারণ নহে। ধনে জগতের অশান্তি শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। ধন রক্ষার জন্য কত অমূল্য মানব জীবন আজ ধরাশায়ী হইতেছে, কত গোলাগুলির প্রয়োজন হইতেছে, কত মানব মারিবার কৌশল উদ্ভাবিত হইতেছে।

আজ যদি জগৎ কেবল উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, আজ যদি জগৎ কেবল খাদ্যাহারীয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পূর্ণ হইত, তাহা হইলে জগতে এই মহামারী ও হাহাকার উপস্থিত হইত কিনা সন্দেহ।

প্রকৃত অভাব মানবকে ব্যতিব্যস্ত করে নাই, যত ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে— কতকগুলা অবান্তর অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার সামগ্রী। বিজ্ঞান একশত বৎসর ধরিয়া কেবল মানবের বিলাস ক্ষুধা পরিতৃপ্তি করিয়াই আসিয়াছে, প্রকৃত কল্যাণের পথে পরিচালিত হয় নাই, মানবকে প্রকৃত কল্যাণের পথ দেখায় নাই। জড় বিজ্ঞান মানবকে দুঃখে সুখানুভবী, দেহাত্মবাদীই করিয়া তুলিয়াছে, প্রকৃত জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে নাই। বিজ্ঞান মানবকে অভাব হইতে অভাবান্তরে পরিভ্রমণ করাইয়াছে, বিজ্ঞান মানবকে জীবনের প্রকৃত পথ বলিয়া দেয় নাই। তাই দেখিতে পাইতেছি যাহারা জগতে কিছুদিন পূর্ব্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি বলিয়া আদৃত হইতেছিল, তাহারাই এক্ষণে যতদূর সম্ভব বর্ব্বরতা ও নির্দ্দয়ভাবের পরিচয় দিতেছে। ইহাতে আমরা আশ্চর্য্য হই নাই। যে সভ্যতা ভোগকে মূল করিয়া, দেহকে সর্ব্বস্ব করিয়া গঠিত হয়, তাহার আদর্শ যে হিংসাকেই প্রশ্রয় দিবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? জীবহত্যা ব্যতীত যাহারা এক মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করিতে পারে না, হিংসাই যাহাদের জীবন, হিংসা দ্বারাই যে তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কত সৌধ আজ ধুলিসাৎ হইতেছে, কত বিধবা ও শিশু পুত্রের রোদন ধ্বনি আজ উত্থিত হইতেছে, কত বৃদ্ধ পিতামাতা আজ প্রাণাধিক পুত্রের শোকে হাহাকার করিতেছে, কত সাধ আজ স্বপ্নের মত মিলাইয়া

যাইতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা স্বপ্নের উপরই গঠিত হইয়াছিল, সত্যের উপরে নহে, দ্বেষ হিংসা ভোগ বিলাসের উপরই দাঁড়াইয়াছিল, সুমহান ত্যাগ ও পরার্থপরতার উপর নহে।

কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ত্যাগ এবং তপস্যাকেই দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিল। ঋষিরা বুঝিয়া ছিলেন—যজ্ঞ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা নহে তপস্যাই শ্রেষ্ঠ। তাই তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন—

"অধর্ম্মো ধর্ম্মঘাতায় প্রারব্ধং পশুভিস্তয়া।
ন্যায়ং ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মোঽয়ং ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে॥
(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং)

"তুমি পশুঘাত করিয়া ধর্ম্মনাশের নিমিত্ত এই অধর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছ। ইহা ধর্ম্ম নহে,ইহা অধর্ম্ম। হিংসাকে ধর্ম্ম বলা যায় না।" হিংসা ধর্ম্মের দ্বার নহে, এইরূপ মহর্ষিরা বলিয়াছেন—স্বকীয় তপস্যা মূলক ধর্ম্ম দ্বারা সহস্র কোটী ঋষি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞ হইতে তপস্যা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা তপস্যা দ্বারাই প্রথমে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তপস্যাই প্রথম মূল বলিয়া যজ্ঞ তপস্যাকে অতিক্রম করিতে পারে না। যজ্ঞ হিংসা মূলক, তপস্যা সৃষ্টি মূলক, যজ্ঞ করিলে দেবত্ব পাওয়া যায় কিন্তু তপস্যায় বৈরাগ্য লাভ হইয়া থাকে। এই লইয়া দেবতা ও ঋষিদিগের মধ্যে মহা বিবাদ ও বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। এই কারণেই মহর্ষিরা যজ্ঞ বা দানের প্রশংসা করেন নাই,কারণ সামান্য ফল মূল শাক ও উদক-পাত্র দান করিয়াই অনেক তপোধন স্বর্গ-গমন করিয়াছিলেন।

আজ সমগ্র জগতকে যজ্ঞের অপেক্ষা তপস্যাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইউরোপকে হিংসামূলক মদ্য ও মাংসাহার পরিত্যাগ করিতে হইবে, ভোগের অপেক্ষা ত্যাগকেই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর আস্থা কমাইতে হইবে এবং যাহাতে জগৎ সচ্ছন্দে চলে তাহারই জন্য সকলকে তপস্যায় বসিতে হইবে। তবেই প্রকৃত সুখের মুখ আমরা দেখিতে পাইব।

এখন আমাদের সুখের অন্বেষণ স্বপ্নমাত্র দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পেটের ভাতে দিন দিন টান পড়িতেছে। জীবন-সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবত বাঙ্গালীর সামাজিক-জীবনে,শিক্ষা-দীক্ষায়,ভাবে-চিন্তায় যেন একটা আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া চলিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে বাঙ্গালার বাঙ্গালী-জীবনে যেন একটা যুগসন্ধি উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য মানবের সামাজিক-জীবন পরিবর্ত্তনশীল। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় সমাজ-জীবনেরও উত্থান পতন আছে। জয় বা পরাজয়, সফলতা বা বিফলতা সংসারেরই নিত্য ঘটনা। ব্যক্তিগত জীবনে সফলতা-বিফলতার প্রভাব অনেক সময়ই আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। একজনের জীবনে আশা, উদ্যম ও উৎসাহ এবং সর্ব্বোপরি তাহার প্রমোদ-প্রফুল্ল মুখচ্ছবি দেখিয়া বুঝি এই ব্যক্তি ক্রমাগত উন্নতির পথেই আরোহণ করিয়াছে। আর একজনের মুখে বিষাদের ছায়া ও নৈরাশ্যের কালিমা দেখিয়া অনেক সময়ে আমরা বুঝিতে পারি যে

তাহার হৃদয় কোন ঘটনায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। *এরূপ দৃষ্টান্ত সংসারের প্রায় সর্ব্বত্র।*

এই দৃষ্টান্ত সমাজ-জীবনেও নিতান্ত কম নয়। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা সামাজিক জীবনের সফলতা ও বিফলতার প্রভাব ততটা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লক্ষ্য করিতে শিখি না। আমরা লক্ষ্য না করিলেও এক একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজের যেন একটা শোচনীয় পরিবর্ত্তন সহসা একদিন আমাদের চক্ষুর নিকটে নাট্য-মন্দিরের পটপরিবর্ত্তনের ন্যায় আসিয়া সমুপস্থিত হয়। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন যে নিতান্তই আকস্মিক ও কার্য্যকারণ পরম্পরা-শূন্য, তাহা নহে। ধীরে ধীরে মানবের, লোক-চক্ষুর অগোচরে, এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া থাকে। একদিন সহসা মানুষ তাহা উপলব্ধি করে। কারণ মানুষের কৃত কর্ম্মের ফলাফল মানুষের জীবনকে চিরকালই প্রবল ভাবে গঠন করিয়া আসিতেছে! মানবসমাজ ব্যক্তিগত জীবনেরই সমষ্টি মাত্র। ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য সমাজের পক্ষেও তাহা সত্য। পৃথিবীর সকল সমাজেই যুগে যুগে এইরূপ যুগ পরিবর্ত্তন হইয়াছে —সকল সমাজেই এইরূপ যুগসন্ধি উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী নানাবিধ জটিল সমস্যায় নিপতিত। বাঙ্গালীর এক মহা যুগসন্ধি উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্যাগুলির মধ্যে জীবিকা সমস্যাই যে প্রধান—একটু প্রণিধান করিলেই সকলে তাহা অবগত হইতে পারেন। এই সমস্যা যেমন কঠিন—সমস্যার সমাধানও তেমনিই কঠিনতর। কিন্তু এ কথা ঠিক যে বাঙ্গালী তাহার এই বর্ত্তমান কঠিন সমস্যায় যদি কোন সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারে, তবে বাঙ্গালার সমাজে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তানের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে না। *কারণ মধ্যবিত্ত ভদ্র* সম্প্রদায়ই সকল দেশের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ।

পূর্ব্বাপেক্ষা এখন নানা কারণে জীবিকা-নির্ব্বাহে ব্যয়বাহুল্য হইতেছে। অথচ জীবিকা-র্জ্জনের প্রাচীন সংকীর্ণ পথগুলি আশানুরূপ প্রশস্ত হয় নাই। ইহাতে মধ্যবিত্তের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। একমাত্র চাকুরী ভিন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের অন্যরূপে জীবিকানির্ব্বাহের বিশেষ কোন উপায় নাই—থাকিলেও তাহাতে তাহাদের মতি নাই। আর এক কথা মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায় দেশোৎপন্ন খাদ্য শস্যাদির গ্রাহক, কিন্তু উৎপাদক নহেন। কাজেই মধ্যবিত্তের জীবিকা সমস্যা দিন দিনই জটিল হইতে জটিলতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই জীবিকার কথা একটা সমস্যার কথাই ছিল না। অনাড়ম্বর পল্লী জীবনে, অতি সরল সহজ ভাবে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তানগণ তখন সুস্থ ও সবল দেহে, বেশ একটা নিশ্চিন্ত শান্তির আরামে বাঙ্গালার শ্যাম-শোভাময় নানা ফলশস্যপূর্ণ গ্রামগুলি ভরিয়া বাস করিতেন। অতি সুলভে প্রচুর পুষ্টিকর আহার্য্য তখন মিলিত—বহু পরিমাণে তাহা গৃহস্থের গৃহে গৃহেই উৎপন্ন হইত। ধুতি ও উড়ুনীতে পুরুষের এবং এক একখানি মোটা শাড়ীতে নারীদের ভদ্রোচিত বেশ হইত। সেই কাপড়ের মোটা সূতাও আবার ঘরে ঘরে মেয়েদের চরকায় উৎপন্ন হইত। মোটা হইলেও এই স্বাস্থ্যকর ভাত কাপড়ের উপরে অন্যান্য উপসর্গ বড়ই কম

ছিল। প্রত্যেকের জন্য এত জামা, জুতা, সেমিজ জ্যাকেট, রেশমী শাড়ী লাগিত না। জন-জনের এত চেন ঘড়ী, মিহি সাড়ী, সোনার জড়োয়া বালা, চুড়ী, নেকলেস, মাকড়ী, অমন চক্ষেও কেহ দেখিত না। এত সাবান ছিল না; এসেন্স ছিল না। সুগন্ধী কেশ তৈলের দরকার হইত না। আমাদের এ সকল এ-কাল ও সে-কালের কথা তুলিলে বাস্তবিক মনে হয়—আমরা স্বর্গ হইতে নরকে পতিত হইতেছি। ইহার দ্বারা শীঘ্রই আমরা মানুষ হইতে পশুতে পরিণত হইব।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

সীতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সীতার বিবাহ।

মণি-মাণিক্য, সোণা-রূপা ও স্ফটিক-প্রবাল পরিশোভিত অযোধ্যার বিরাট রাজসভা-গৃহের রত্নময় বিচিত্র সিংহাসনে বসিয়া রাজা দশরথ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। রাজাসনের কিঞ্চিৎ দূরে দক্ষিণে ও বামে যথা-যোগ্য আসনে সচিববর্গ উপবিষ্ট। অদূরে ব্যাসদেব মুনির উচ্চাসন। ঋষিবর মকমলাচ্ছাদিত রত্নাসনের উপর কৃষ্ণাজিন পাতিয়া বসিয়া আছেন। রাজা, অমাত্যগণের সহিত রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ব্যাসদেবের সহিত দুই একটি শাস্ত্র-কথা বলিতে-ছেন। এমন সময় প্রতীহারী আসিয়া কৃতাঞ্জলী-পুটে নিবেদন করিল—"মহারাজ! মহর্ষি বিশ্বামিত্র তোরণ-দ্বারে দণ্ডায়মান।" নৃপতি প্রতীহারীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন—"ত্বরায় তাঁহাকে বিশ্রাম-ভবনে লইয়া যাও, আমিও শীঘ্র তথায় যাইতেছি।"

অনতিবিলম্বে সভা ভঙ্গ হইল। নৃপতি বিশ্রাম-ভবনে উপনীত হইয়া মহর্ষির চরণ-বন্দনা পূর্ব্বক তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! নিশাচরগণের উপদ্রবে যাগাদি পুণ্য-কার্য্যের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছে। আপনি এ রাজ্যের রাজা; প্রকৃতিরঞ্জন ও প্রজা-বিঘ্ন দূরীকরণই প্রকৃষ্ট রাজধর্ম্ম, আপনি রাক্ষসদিগকে দমন করিয়া আমাদের পুণ্যকর্ম্মের সহায় হউন। মহারাজ, দয়া করিয়া ঋষি-যজ্ঞ রক্ষার্থে কিছু-দিনের জন্য রামচন্দ্রকে আমাদের আশ্রমে সশস্ত্র অবস্থানের অনুমতি দিউন। মহাবীর রামচন্দ্র ব্যতীত এ দুর্দ্দান্ত নিশাচরদিগকে দমন করা অন্যের সাধ্য হইবে না। অতএব রামচন্দ্রকে আমার সহিত তপোবনে যাইবার আজ্ঞা করিয়া আমাদের যজ্ঞ-বিঘ্ন বিদূরীত করুন।"

ঋষি-বাক্য সম্পূর্ণ হইলে রাজা মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া অনতিবিলম্বে রাম ও লক্ষ্মণকে আপনার নিকট ডাকিয়া আনিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে মহর্ষির হস্তে তুলিয়া দিলেন। অতঃপর মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ সহ প্রীতি-প্রফুল্ল-মনে স্বীয় আশ্রম তপোবনে প্রতিগমন করিলেন।

মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণের অপরিসীম সাহস,

শৌর্য্য-বীর্য্য প্রভাবে আশ্রমনিবাসী মুনি-ঋষিগণের তপোবিঘ্ন দূর হইল। এতদিনে ব্রত-বিদ্বেষী নিশাচরগণের দর্প খর্ব্ব হইল। তপোবিঘ্ন তিরোহিত হওয়ায় রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বিপুল হর্ষভরে বিজয়শ্রীলব্ধ ভ্রাতৃ-যুগলকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। এবং বিজয় গর্ব্ববিহীন সুধীর রাম-লক্ষ্মণ ও প্রগাঢ় ভক্তিভরে ঋষির পাদপদ্মে অভিবাদন করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় আদেশ প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় রহিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র আরব্ধ-যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থান করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। মহর্ষির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহারাও যজ্ঞ-সম্পন্ন-কাল পর্য্যন্ত তপোবনে বাস করিতে সম্মত হইলেন। যথাকালে নির্ব্বিঘ্নে ঋষি-যজ্ঞ সম্পন্ন হইল!

অনন্তর রাজর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সাদর-সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন—"বৎসগণ! মঙ্গলময় শ্রীভগবানের কৃপায় তোমাদের বাহু-বলে নিশাচরগণ বিতাড়িত হওয়ায় আমাদের আরব্ধ-যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। কিন্তু আমার প্রিয়সখা রাজর্ষি জনকের আরব্ধ-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল কি না জানিতে না পারায় বিশেষ উদ্বিগ্ন আছি। ঋষি-বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীমান রামচন্দ্র রাজর্ষি জনকের সবিশেষ পরিচয় জানিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার বিশদ পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন—"বৎস! কিছুদিন হইল তিনি এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সে যজ্ঞে আমাদেরও নিমন্ত্রণ আছে, আমি মনে করিয়াছি আগামী কল্য তোমাদিগকে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ মিথিলায় জনক-ভবনে গমন করিব।"

অতঃপর বিশ্বামিত্র বলিলেন—"বৎসগণ! বোধ করি তোমরা বিশ্বম্ভরাদেবী-প্রসূতা অগর্ভসম্ভবা কন্যা জনকরাজ-দুহিতা সীতাদেবীর কথা শ্রুত আছ। সীতা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। রাজর্ষি এই সর্ব্বসুলক্ষণা পরম রূপবতী অনন্য সাধারণ গুণশালিনী সীতার বিবাহের জন্য এক ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছেন। যে বীর সেই অদ্ভুত হরধনুতে জ্যা যোজনা করিতে পারিবেন, এই সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যারত্ন তাঁহারই করে অর্পিতা হইবেন। তোমরা আমার সহিত মিথিলায় গমন করিলেই এই দুই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া প্রীতিলাভে সমর্থ হইব।

ঋষি-বাক্য শ্রবণ করিয়া জানকী ও হরধনু দর্শন জন্য রাম-লক্ষ্মণের মনে যারপরনাই কৌতূহল জন্মিল। এবং তাঁহারা মহর্ষি সহ মিথিলায় গমন করিতে পরম উৎসাহের সহিত সসম্ভ্রম সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

পরদিন অতি প্রত্যূষে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণ সহ মিথিলা-নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, মিথিলেশ্বর এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সুশোভিত সুবিশাল যজ্ঞাগারের মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড যজ্ঞবেদীর উপর বসিয়া আচার্য্যেরা উদত্তাদিস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছেন, হবিসিক্ত যজ্ঞ-কাষ্ঠ, পুষ্প-বিল্বদল ও বিবিধ ফলমূহ সমূহ প্রদীপ্ত

হুতাশনে সযত্নে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক পরিচারকবৃন্দ হবিভাণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান, যজ্ঞবেদীর সম্মুখ দিকে কিয়দ্দূরে নানা স্থানাগত নিমন্ত্রিত নৃপতিবর্গ ও আত্মীয়স্বজনেরা বসিয়া পরস্পর শিষ্টালাপে নিমগ্ন আছেন, বামভাগে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বিবিধ শাস্ত্রালাপে নিরত, দক্ষিণ পার্শ্বে ধর্ম্মাত্মা ঋষিগণ অজিনাচ্ছাদিত রত্নাসনে বসিয়া ধর্ম্ম-তত্ত্বের গভীর আলোচনায় লিপ্ত আছেন, অপর দিকে রাজভৃত্যগণ যজ্ঞীয় সামগ্রীসম্ভার মস্তকে বহিয়া আনিয়া যজ্ঞবেদীর অদূরে সযত্নে রক্ষা করিতেছে। ফলতঃ যজ্ঞাগারের যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সর্ব্বত্রই যজ্ঞীয় সমারোহপূর্ণ—মিথিলা-ভবন পবিত্র উৎসব-উল্লাসে নিয়ত মুখরিত।

তাঁহারা যজ্ঞীয় পবিত্র দৃশ্যাবলী সন্দর্শন করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজর্ষি জনক তথায় উপস্থিত হইয়া মহর্ষিকে সসম্ভ্রম অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সাদরে যথাযোগ্য স্থানে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইলেন। রাজর্ষি বিনয়-মধুর বচনে প্রথমে তপোবনের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া অনন্তর বিশ্বামিত্রকে প্রীতি-প্রফুল্ল-বদনে বলিলেন—"মহর্ষির আগমনে আজ মিথিলাপুরী ধন্য হইল। যেমন পূর্ণচন্দ্র দর্শনে জলধির জল উদ্বেলিত হইয়া উঠে, আপনার দর্শনে আমার প্রাণও আজ তেমনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে; মহর্ষির আগমনে আমার আরব্ধ-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। রাজা জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত এরূপ শিষ্টালাপ করিতেছেন, আর রাম-লক্ষ্মণের প্রতি পুনঃপুনঃ তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। তিনি রাম-লক্ষ্মণের সামর্থ-সারময় মোহন মূর্ত্তি, অলৌকিক গাম্ভীর্য্য, অসামান্য সর্ব্বসুলক্ষণ ও অনুপম সৌম্যাকৃতি অবলোকন করিয়া বিস্মিতের ন্যায় অতৃপ্ত-নয়নে বারংবার তাঁহাদের মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাদিগকে ঋষি-কুমার বলিয়াই তাঁহার মনে প্রতীত হইল; অনন্তর তাঁহাদের দেহশ্রী, সুদীর্ঘ বাহুদ্বয়, প্রশস্ত ললাট, সুবিশাল ও সমুন্নত বক্ষ, সুবঙ্কিম ভ্রূযুগ, সুবিস্তীর্ণ চক্ষুযুগল, এবং অসীম বীরত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী দর্শন করিয়া তাঁহার মনে হইল, ইহাঁরা কখনই ঋষি-তনয় নহে; ঋষি-পুত্র হইলে ইহাঁদের পৃষ্ঠদেশে তূণীর, বাম হস্তে কার্ম্মুক ও দক্ষিণ করে বীরচিহ্ন অসিলতা শোভা পাইবে কেন? নিশ্চয় ইহাঁরা কোনও ক্ষত্রিয়-রাজকুমার হইবেন।

রাজর্ষি জনক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, "মহর্ষে! এই বীর বালক দু'টি কে? ইহাঁরা কোন্ মহাবংশের সুকৃতিধ্বজা? কোন্ পুণ্যাত্মার কুলপাবক?" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "রাজর্ষে! এই বালক দু'টি অযোধ্যাধিপতি ভুবনবিজয়ী মহাত্মা রাজা দশরথের পুত্র। ইহাঁদের জ্যেষ্ঠটীর নাম রাম এবং কনিষ্ঠের নাম লক্ষ্মণ। ইহাঁরা উভয়েই মহাবীর এবং চরিত্র প্রভাবে মহা প্রশংসিত মহা সুজন।" একথার পর মহর্ষির আজ্ঞানুসারে রাম ও লক্ষ্মণ রাজর্ষির চরণে অভিবাদন করিলেন। রাজা উভয়কে

সাদর আলিঙ্গন করিয়া "জয়শ্রী লাভ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বিশ্বামিত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহর্ষে! রাজা দশরথ মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের কৃপায় যে চারিটী পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন, ইঁহারা কি সেই যজ্ঞীয় চরুসম্ভূত পুত্ররত্ন? আহা! ইহারা যেন পুণ্যাত্মা রাজা দশরথের পুণ্য-পতাকা স্বরূপ!" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "হাঁ রাজর্ষে! ইহারা সেই ক্ষীর-সাগর সমুদ্ভূত মহারত্নই বটে!"

অতঃপর রাজর্ষি জনক নানা কথা প্রসঙ্গে রাম লক্ষ্মণের প্রতি যারপর নাই স্নেহ-যত্ন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জনকের আন্তরিক অভিপ্রায় ও উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিলেন, "রাজর্ষে! ইহারা হর-ধনু দর্শন জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন, অতএব আপনি ত্বরায় এখানে হর-ধনু আনয়ন করিবার নিমিত্ত কিঙ্করদিগকে অনুমতি প্রদান করিয়া ইঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।

ঋষি-বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকের প্রাণ সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, শত শত মহাবল রাজপুত্রগণ যে ধনুতে জ্যা যোজনা করিতে পারেন নাই, রাবণাদি বীরপুরুষেরা যে ধনু উত্তোলন করিতে না পারিয়া লজ্জাবনত-বদনে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, এমন কি যে বিশাল ধনু এ পর্য্যন্ত কোনও বীরপুরুষ তুলিতেও সমর্থ হন নাই, এ সুকুমার তরুণ যুবা সে বিরাট ধনুতে কেমন করিয়া জ্যা রোপণ করিতে সমর্থ হইবেন? হায়! তবে কি আমার এ নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা প্রাণাধিক প্রিয়তমা সীতা-বিবাহের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল? তবে কি মা আমার চির-কুমারীই থাকিবেন? বিধাতা কি জানকীর অদৃষ্টে বিবাহ লিখেন নাই?

রাজর্ষিকে মৌন দেখিয়া বিশ্বামিত্র তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"সখে! বয়সে বালক দেখিয়া আপনি মহাবীর রামচন্দ্রের বাহুবলে অবিশ্বাস করিবেন না। যে বীর অবলীলাক্রমে ভীষণ দর্শনা তাড়কা, অমিত বলশালী সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষস চমূর বিনাশ সাধন করিয়াছেন, মারিচাদি মহাবলী রাক্ষসেরা যাঁহার ভুজবলে ভীত হইয়া সুদূরে পলায়ন-পর হইয়াছে, শিবশরাসনে জ্যা যোজনা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হয় না। হয়ত রামের সমকক্ষ কোনও বীর হর-ধনুতে জ্যা যোজনা করিবার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত আপনার ভবনে উপস্থিত হন নাই, তাঁহারা রামের ন্যায় অপরিসীম বাহুবলশালী হইলে কখনই এ ধনুর্ভঙ্গ না করিয়া ক্ষুণ্ণমনে স্বস্থানে ফিরিতেন না। আপনি নিঃসংশয়ে অনতিবিলম্বে শ্রীরামচন্দ্রকে ধনু প্রদর্শন করুন। দেখিতেছেন না, অদম্য বীরত্ব-উৎসাহে বৎসের নয়ন-যুগল কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে?

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া জনক সহর্ষে অনুচরদিগকে শিবধনু আনিতে অনুজ্ঞা করিলেন। রাজাদেশে অবিলম্বে অনুচরেরা সভাস্থলে ধনু আনয়ন করিলে বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে সে বিশাল ধনুতে জ্যা যোজনা করিবার নিমিত্ত অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। অনন্তর ধীমান রামচন্দ্র অবনত-মস্তকে মহর্ষির চরণ বন্দনা করিয়া সকৌতুকে শিবশরাসনের